# মাইকেল মধুসূদন দত্তের

## জীবন-চরিত

১৯৪৩ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক Rapid Readingএর পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত

# মাইকেল মধুসূদন দত্তের
# জীবন-চরিত

[ বিদ্যালয়-পাঠ্য সংস্করণ ]


যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি. এ.
প্রণীত


পঞ্চম সংস্করণ

"কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। ** কবিতা কবির কীর্ত্তি, তাহা ত আমাদের হাতেই আছে, পড়িলেই বুঝিব; কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়


চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড,
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

১৯৪০

মূল্য চৌদ্দ আনা

প্রকাশক—
শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এস্-সি.
১৫নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫নং ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

# উৎসর্গ-পত্র

যাঁহার উৎসাহ, অনুরাগ ও সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে

এ গ্রন্থ রচিত হইত না

এবং

পরলোকগত সুহৃদের প্রতি আজীবনব্যাপী অনুরাগের জন্য

**যিনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র**

মধুসূদনের সেই চিরনিষ্ঠ, অকৃত্রিম সুহৃদ্

**বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয়কে**

মধুসূদনের এই জীবন-চরিত

সমাদরে

উপহার অর্পিত হইল

# বিজ্ঞাপন

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী করিয়া মধুসূদনের জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। ইহার কোন কোন স্থল মূল গ্রন্থ হইতে অবিকল উদ্ধৃত এবং কোন কোন স্থল নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থে যাহা প্রায় সাত শত পৃষ্ঠায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা যে এক শত বাষট্টি পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করা সম্ভবপর নয়, তাহা বোধ হয় বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ছাত্রদিগের জ্ঞাতব্য কোনও বিষয় সাধ্যানুসারে যদিও আমি ত্যাগ করি নাই, তথাপি ইহাতে বহু অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হইবে বলিয়াই আমার আশঙ্কা হয়। দুইটি বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিতে না পারিয়া আমি দুঃখিত। প্রথম, মধুসূদনের গ্রন্থাবলীর সমালোচনা; দ্বিতীয়, তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত পত্রাবলী। কবিতারচনার ন্যায় পত্ররচনাতেও মধুসূদনের অসাধারণ শক্তি ছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই সকল পত্রে লক্ষিত হইবে। যাঁহারা তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের বিকাশ দেখিতে চান, তাঁহাদিগকে মূল গ্রন্থ হইতে এই সকল পত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বাঙ্গালাভাষা-শিক্ষার্থী প্রত্যেক ছাত্রকেই মধুসূদনের কোন না কোন কাব্য হইতে উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিতে হয়। কবির কবিতা পাঠের সঙ্গে কবিকে জানিবার জন্য স্বভাবতঃই আকাঙ্ক্ষা জন্মে। বর্ত্তমান সংস্করণ হইতে সেই আকাঙ্ক্ষা যদি কিয়ৎপরিমাণেও তৃপ্ত হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক বোধ করিব। ইতি—

কলিকাতা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু

# বিজ্ঞপ্তি

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সুবিস্তৃত জীবনী লেখক খ্যাতনামা সাহিত্যিক পরলোকগত পরম শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রছাত্রীগণের পাঠোপযোগী করিয়া উক্ত গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা সে সময় যথেষ্ট জনাদর লাভ করিয়াছিল। আমিও তখন পুস্তকখানি সাগ্রহে পাঠ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ উক্ত পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার প্রয়াসী হইয়া আমাকে অনুরোধ করেন যে, প্রয়োজন বোধ করিলে আমি ঐ পুস্তকখানির সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করিয়া দিব। আমি পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সে সকলের কোন প্রয়োজনই অনুভব করিলাম না। কারণ শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রবাবুর ভাষা ও রচনা-পদ্ধতিকে আমি এখনও বাংলা সাহিত্যের আদর্শ-স্থানীয় বলিয়া মনে করি। তাই আমার অনুরোধে যোগীন্দ্রবাবুর পুত্রগণ পুস্তকখানি যেমন ছিল তেমন ভাবেই ছাপিয়াছেন। এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচনের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত আছে, এই সুন্দর ও সুলিখিত জীবন-চরিতখানির দিকে তাঁহাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

১লা আষাঢ়, ১৩৪৫ — **শ্রীজলধর সেন**

# বিষয় নিরূপণ

# মাইকেল মধুসূদন দত্তের

# জীবন-চরিত

## প্রথম অধ্যায়

### বাল্যজীবন

যশোহর-নগরের আঠাশ মাইল দক্ষিণে সাগরদাঁড়ী নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। প্রসন্নসলিলা কপোতাক্ষী ইহার তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বাঙ্গালা ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ, ইংরাজী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারি, এই গ্রামে মেঘনাদবধ-কাব্য-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম হয়।

জন্মভূমি

সাগরদাঁড়ী মধুসূদনের পূর্ব্বপুরুষদিগের আদি বাসস্থান নয়। তাঁহার পিতামহ রামনিধি দত্ত প্রথমে এখানে আসিয়া মাতামহাশ্রয়ে বাস করেন। রামনিধির চারি পুত্র। মধুসূদন তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ রাজনারায়ণের পুত্র।

বংশকথা

মধুসূদনের পিতা ও পিতৃব্যগণ সকলেই বুদ্ধিমান্, উপার্জ্জনক্ষম এবং স্বধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। সে সময়ে যেরূপ

বিদ্যার সমাদর ও প্রচলন ছিল, তাঁহারা কেহই তাহার উপার্জ্জনে ক্রটী করেন নাই। দানশীলতা, সৌজন্য এবং অতিথি-অভ্যাগতের সেবা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণের জন্য, সাগরদাঁড়ীস্থ দত্ত-পরিবার এখনও তাঁহাদিগের স্বদেশীয় সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন, ইঁহাদিগের চারি ভ্রাতার দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা তাঁহাদিগের পরিবারে প্রবেশলাভ করিয়াছিল।

মধুসূদনের পিতামহ রামনিধি দত্তের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য রাধামোহন দত্ত হইতেই তাঁহাদিগের বংশের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। রাধামোহন তৎকাল-সমাদৃত পারস্য-ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার উন্নতির সঙ্গে তাঁহার অপর ভ্রাতাদিগেরও উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। চারি ভ্রাতাই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এবং তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ ও দানাদিদ্বারা দত্তবংশ, এক সময় যশোহর-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।*

কুলক্রমাগত প্রকৃতি

কুলক্রমাগত প্রকৃতি অনুসারে মধুসূদন মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে পারিতেন। ধূলিমুষ্টি ও অর্থ উভয়ের মধ্যে তাঁহার নিকট অধিক ইতরবিশেষ ছিল না। এই ব্যয়শীলতার ন্যায় কবিশক্তিও তিনি কিয়ৎপরিমাণে পিতৃপুরুষগণের প্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার পিতৃমাতৃবংশীয়-গণের মধ্যে প্রকৃত কবি নামের উপযুক্ত কোন ব্যক্তি কখনও জন্মগ্রহণ

---

* দত্তবংশের ব্যয়শীলতা সম্বন্ধে একটি বৃত্তান্ত নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। প্রথম চাকুরীর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য রাধামোহন দত্ত পুত্রের কল্যাণোদ্দেশ্যে একই দিনে ১০৮ কালীদেবীর পূজা করেন। তাহাতে ১০৮টি মহিষ, ১০৮টি মেষ এবং ১০৮টি ছাগ একসঙ্গে বলি প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ১০৮টি সুবর্ণ-নির্ম্মিত জবাপুষ্প অঞ্জলি অর্পিত হইয়াছিল। সাগরদাঁড়ীর প্রাচীন ব্যক্তিগণ এখনও এই পূজার বিষয় সগৌরবে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

করেন নাই; তথাপি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকে কবিতানুরাগী ছিলেন, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত স্বয়ং কবিশক্তিসম্পন্ন না হইলেও, একজন বিশেষ গুণগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। কবিতা, সঙ্গীত এবং শিল্প প্রভৃতি সুকুমার কলায় তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তিনি একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেন। পুরাঙ্গনাদিগের মধ্যে যাঁহারা শিল্পকার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য অনেক সময় পুরস্কার দান করিতেন। যে সৌন্দর্য্যোপাসনা মধুসূদনের চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল, তাহা তিনি তাঁহার পিতৃ-প্রকৃতি হইতেই লাভ করিয়াছিলেন।

পিতার প্রকৃতি

চারি ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়া রাজনারায়ণ দত্ত জ্যেষ্ঠ সহোদরদিগের বড়ই আদরের পাত্র ছিলেন এবং সেই জন্য বাল্য হইতে বিলাসিতায় ও ভোগসুখে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিলাসস্পৃহ ছিলেন বলিয়া,তিনি কখনও বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী হন নাই। পারস্য-ভাষায় তাঁহার অতি সুন্দর ব্যুৎপত্তি ছিল এবং সেইজন্য তিনি পরে মুন্সী রাজ-নারায়ণ আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধিবলে তিনি পরিণামে সদর-দেওয়ানী-আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় প্রতিপত্তিশালী উকীল সদর-দেওয়ানী-আদালতে অতি অল্পই ছিলেন। অপর ভ্রাতাদিগের ন্যায় তিনিও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এবং মুক্ত-হস্তে ব্যয় করিতেন। দানশীলতা তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল। যে সরস বাক্‌পটুতাগুণে মধুসূদন সকলকে মুগ্ধ ও পুলকিত করিতে পারিতেন, তিনি তাহা তাঁহার পিতারই নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুত্র পিতার দোষগুণ

উভয়েরই অধিকারী হইয়া থাকেন; মধুস্থদনেও এ নিয়মের অন্যথা হয় নাই। পিতার বিদ্যানুরাগ, সহৃদয়তা, বুদ্ধিমত্তা এবং বাক্‌পটুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সহিত বিলাসিতা, অপরিমিতব্যয়িতা প্রভৃতি দোষও তিনি পিতার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আত্মসংযমেই যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব, পিতা, পুত্র কাহারও সে জ্ঞান ছিল না।

মধুস্থদনের পিতার চারি বিবাহ। প্রথমা পত্নীর জীবদ্দশাতেই রাজনারায়ণ দত্ত আর তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন। মধুস্থদন প্রথমার গর্ভসম্ভূত। তাঁহার পিতৃবংশের ন্যায় মাতৃবংশও এক সময়ে যশোহর-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ ছিল। তাঁহার মাতা জাহ্নবী দাসী বর্ত্তমান খুলনা জিলার অন্তর্গত কাট্‌পাড়ার জমীদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা ছিলেন। সহৃদয়তা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণ মধুস্থদন যেমন তাঁহার পিতৃ-প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বাভাবিক সরল, উদার মন ও প্রেম-প্রবণ কোমল হৃদয় তিনি তেমনই তাঁহার মাতৃ-প্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার ন্যায় স্নেহপরায়ণা ও পরদুঃখকাতরা রমণী, স্বভাব-কোমলা বঙ্গ-মহিলাদিগেরও মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামীর ন্যায় তিনিও মুক্তহস্তে দান করিতেন এবং আমোদ, আহ্লাদে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। স্বামিসেবা তিনি পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন, এবং কখনও কোন বিষয়ে স্বামীর প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইতেন না। তাঁহার জীবদ্দশাতে রাজনারায়ণ দত্ত যদিও আর তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কখনও স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই। মধুস্থদন মান্দ্রাজে গমন করিলে, রাজনারায়ণ দত্ত পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন—"দেখ, আমাদিগের পুত্রটি ত আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল, তোমার আর সন্তান হইবার আশা নাই, আমাদিগের জলপিণ্ডের উপায় কি হইবে?"

মাতার প্রকৃতি

জাহ্নবী দাসী শুনিয়া অম্লানমুখে বলিয়াছিলেন—"তুমি পুনরায় বিবাহ কর, তোমার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল ; যদি তোমার পুত্র জন্মে, তুমিও স্বর্গ-লাভের অধিকারী হইবে, আমিও হইব।" বহুপত্নীক হইলেও রাজ-নারায়ণ দত্ত এই সকল কারণে জাহ্নবী দাসীকেই সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করিতেন, এবং সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। মধুসূদন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তিনি তাঁহারই অনুরোধে মধুসূদনকে বহুদিন প্রচুর পরিমাণে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন।

বাল্য-কথা

মধুসূদন যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন দত্তবংশের বিশেষ সৌভাগ্যের অবস্থা ; সুতরাং তাঁহার জাত-কর্ম্মাদি অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল এবং চারি ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠের পুত্র বলিয়া তাঁহার আদরের সীমা ছিল না। তাঁহার জন্মগ্রহণের চারি বৎসরের মধ্যে তাঁহার আরও দুইটি ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু উভয়েরই অতি শৈশবে মৃত্যু হয়। দুইটি ভ্রাতার অকাল-মৃত্যুতে এবং অপর ভ্রাতা ভগিনীর অভাবে মধুসূদন পিতা,মাতা,পিতৃব্য এবং অন্যান্য আত্মীয়গণের একান্ত স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। যেরূপ আদরে ও গৌরবে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল অনেক রাজপুত্রেরও, বোধ হয় সেরূপ হয় না*। তাঁহার বাল্যের ভোগবিলাসের কথা আলোচনা করিলে তাঁহার ভবিষ্যৎজীবনের অমিতব্যয়িতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাঁহাকে দোষ দিতে প্রবৃত্তি হয় না। অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ গুরুজনেরা তাঁহাকে সকল কার্য্যে প্রশ্রয়

* কিরূপ আদরে তাঁহার শৈশব অতীত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ দুই একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি স্নানার্থ গমন করিলে, কি জানি যদি তাঁহার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয়, এই আশঙ্কায় ক্রমে ক্রমে ৫।৭টি চুল্লীতে অন্ন প্রস্তুত হইতে থাকিত। প্রত্যাগমন করিয়া যে চুল্লীর অন্ন সর্ব্বাপেক্ষা সুসিদ্ধ হইত, তিনি তাহা আহার করিতেন।

দান করিতেন। তাঁহার যখন যাহা ইচ্ছা হইত, তিনি তখন তাহাই করিতেন ; বিশেষ অন্যায় কার্য্য করিলেও কেহ তাঁহাকে নিবারণ করিতেন না। শৈশবে গুরুজনদিগের এইরূপ প্রশ্রয়দানের ফল এই হইয়াছিল যে, বাল্য হইতেই মধুসূদন স্বেচ্ছাচারে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন এবং সেই জন্য উত্তরকালে যে কার্য্য তাঁহার ভাল বোধ হইত, সঙ্গতই হউক, আর অসঙ্গতই হউক, তিনি তাহা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। অন্যান্য অনেক সদ্‌গুণের ন্যায় আত্মসংযমও বাল্য হইতে শিক্ষা না করিলে, পরিণত বয়সে শিক্ষা করা দুরূহ হইয়া দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যক্রমে পিতামাতার ও আত্মীয়গণের অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ, মধুসূদন শৈশবে আত্মসংযম শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই।

শৈশবে মধুসূদন তাঁহার স্নেহপ্রবণ-হৃদয়া জননীর প্রকৃতই অঞ্চলের ধন হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। জাহ্নবী দাসী সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হইয়াই পুত্রকে ভালবাসিতেন এবং একদণ্ডের জন্য তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন। মধুসূদন পাঠশালায় যাইলে তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। মধুসূদনের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পর তিনি প্রকৃতই জীবন্মৃতা হইয়াছিলেন। সেই অবধি সাংসারিক কোন কার্য্যেই তাঁহার আসক্তি ছিল না ; যতদিন জীবিত ছিলেন, পুত্রের চিন্তাতেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় মধুসূদন মান্দ্রাজে ছিলেন। জন্মের মত পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিতেন। মৃত্যুর কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তিনি কোন আত্মীয়াকে বলিয়াছিলেন ;—"আমি জীবনে মরিয়া আছি ; জ্বলন্ত শোকের আগুনে আমাকে কয়লা করিয়া ফেলিয়াছে, আমি মরিয়াই বাঁচিব ; কিন্তু আমার বাছা যে সাত সমুদ্রের পারে রহিয়াছে, তাহার মুখখানি না দেখিয়া আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।" মধুসূদনও যখন যাহাকে ভালবাসিতেন, প্রাণ, মন ঢালিয়া

ভালবাসিতেন। ভালবাসিবার এই প্রবৃত্তি এবং শক্তি তিনি তাঁহার মাতার প্রকৃতি হইতেই লাভ করিয়াছিলেন।

বাল্যে মধুসূদন অতি অমায়িক-প্রকৃতি ছিলেন। বাটীর দাসদাসী-দিগকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পুরস্কারের জন্যই হউক বা অন্য কোন প্রয়োজনেই হউক, তাহারা তাঁহাকে আসিয়া অনুরোধ জানাইত। প্রতিবাসিগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে কোন দুঃখ জানাইলে তিনি কখনও তাহা মোচন করিতে ক্রটী করিতেন না। তিনি পিতামাতার আদরের ধন ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকিত না। পূর্ণ বয়সে নানা বিষয়ে মধুসূদনের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল; কিন্তু শৈশবার্জ্জিত অমায়িকতা, সহৃদয়তা এবং পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি গুণের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

মধুসূদনের সাত বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতা কলিকাতা সদর-দেওয়ানী-আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন।

বিদ্যারম্ভ

তিনি খিদিরপুরে একটি বাটী ক্রয় করিয়া তথায় অবস্থান করিতেন; আর মধুসূদনের জননী পুত্রকে লইয়া সাগরদাঁড়ীর বাটীতে থাকিতেন। মধুসূদন মাতার নিকট থাকিয়া গ্রামস্থ পাঠশালায় অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীতে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়া গিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই শৈশবে তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্ব-লক্ষণ সূচিত হইয়াছিল। অধ্যয়নাসক্তি ও কাব্যানুরাগই মধুসূদনের চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ। বাল্য হইতেই এই দুইটি গুণ তাঁহার প্রকৃতিতে লক্ষিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ ধনিসন্তানদিগের প্রায়ই লেখাপড়ায় অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। তাহার উপর যে সকল বালক গুরুজনদিগের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হয়, তাহারা বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে একেবারেই অমনোযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু মধুসূদন ঐশ্বর্য্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান

এবং গুরুজনদিগের অত্যধিক আদরের পাত্র হইয়াও কখনও লেখা-পড়ায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। পাঠশালার ছাত্রদিগের মধ্যে কিসে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। কি গ্রামস্থ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়, কি হিন্দু কলেজে, সহাধ্যায়িগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে লেখা-পড়ায় অতিক্রম করিবে, ইহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

উচ্চাভিলাষ ও বিদ্যানুরাগ

উচ্চাভিলাষই মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত জ্ঞান, ধর্ম্ম, অর্থ কোন বিষয়েই মনুষ্য শ্রেষ্ঠতালাভে সমর্থ হয় না। মহত্ত্ববীজ এই উচ্চাভিলাষ বাল্য হইতেই মধুসূদনের প্রকৃতিতে লক্ষিত হইত। সমকালবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইব, পূর্ণ-বয়সে ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, এবং যতদিন না তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, ততদিন তিনি নিরস্ত হন নাই। তাঁহার বাল্যের উচ্চাভিলাষ তাঁহার জননীর প্রদত্ত উৎসাহ-বাক্যে এবং তাঁহার পিতার আদর্শে সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার জননী অতি সম্ভ্রান্ত গৃহের দুহিতা ছিলেন। পিতৃকুলের সম্ভ্রমে এবং কৃতী স্বামীর ও প্রতিভাবান্ পুত্রের গৌরবে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন। সাধারণ নারীগণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হইত না। মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলে যে মহদভিলাষ মনুষ্যের হৃদয়ে স্বভাবতঃ উদিত হইয়া থাকে, জাহ্নবী দাসী মেধাবী পুত্রের হৃদয়ে তাহা বদ্ধমূল করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। মধুসূদনের পিতাও তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যবহারাজীব ছিলেন। পিতার সম্ভ্রম ও কৃতিত্ব বালক মধুসূদনকে মহত্ত্বলাভে প্রণোদিত করিত। সেই জন্য লেখাপড়া সম্বন্ধে তাঁহাকে কোনদিন কাহারও তাড়না করিবার প্রয়োজন হয় নাই; নিজের উচ্চাভিলাষ ও আন্তরিক বিদ্যানুরাগ-গুণেই

তিনি বঙ্গদেশের একজন অগ্রগণ্য বিদ্বান্ হইয়াছিলেন। কি পঠদ্দশায়, কি শিক্ষকতা কার্য্যের সময়, কি ব্যারিষ্টারাবস্থায়, মধুসূদন কখনই বিদ্যোপার্জ্জন সম্বন্ধে অযত্ন প্রকাশ করেন নাই। ছাত্রাবস্থায় হিন্দু-কলেজে থাকিতে তিনি যেমন যত্ন-সহকারে গ্রন্থাভ্যাস করিতেন, মান্দ্রাজে শিক্ষকতা কার্য্য করিবার সময়েও তেমনই করিতেন। মান্দ্রাজে থাকিতে তেলেগু, তামিল, হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষা এবং ফ্রান্সে থাকিতে ফরাসীস্, জর্ম্মাণ ও ইতালীয় প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি দেহ, মন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয় এবং লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, যখনই যেখানে সুবিধা পাইয়াছিলেন, তখনই সেখান হইতে গ্রন্থরাশি আনাইয়া নিজের জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। রোগ, দরিদ্রতা এবং পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতি যে সকল বিঘ্ন মনুষ্যের জ্ঞান-লালসা বিশুষ্ক করিয়া দেয়, মধুসূদনের জীবনে তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না; কিন্তু নিত্য-প্রবহনশীল উৎসের ন্যায় তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা সংসারের কঠোর নিদাঘতাপের মধ্যেও তাঁহার হৃদয় হইতে নিরন্তর নিঃসৃত হইত। এই জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা এবং কাব্যানুরক্তি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

"এ ধরার কর্ম্মভার মন বেদনিলে,
কার কর-পদ্ম-স্পর্শে সারে সে বেদনা
বরদার দয়াসম? হাত বুলাইলে,
জননী, ব্যথিত দেহে, কোথা ব্যথা থাকে?
একথা তোমার কাছে অবিদিত নহে।" *

সংসার-যন্ত্রণায় নিপীড়িত হৃদয় যে বাগ্দেবীর "করপদ্মস্পর্শে" সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতে পারে, মধুসূদন আত্ম-জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

---

* মধুসূদনের অপ্রকাশিত কবিতা হইতে গৃহীত।

মধুসূদন বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত শিক্ষার ও অধ্যয়নের নিষ্কর্ষ, তাঁহার কাব্যানুরক্তি। নানাদেশীয় কাব্য-শাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি বঙ্গদেশে বোধ হয় এ পর্য্যন্ত অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের অন্যান্য অনেক গুণের ন্যায় এই কাব্যানুরাগও তাঁহার জননীর প্রদত্ত শিক্ষা হইতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে সময়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার বড় প্রচলন ছিল না। কিন্তু জাহ্নবী দাসী তৎকালেও লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারত এবং কবিকঙ্কন চণ্ডী প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্যসমূহ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল; পঠিত গ্রন্থের অনেক অংশ তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মেধাবী মধুসূদন আট দশ বৎসর বয়সের সময়ে মাতাকে ও বাটীর অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদিগকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন,-মনুষ্য মাতৃস্তন্যের সহিত যাহা শিক্ষা করে, জীবনে তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারে না।, মধুসূদনের সম্বন্ধে একথা অতি সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বহু ভাষায় এবং বহু গ্রন্থে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও, মাতৃ-প্রদত্ত শিক্ষার ফলে, রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে মধুসূদনের অনুরাগের কখনও খর্ব্বতা হয় নাই। পূর্ণ বয়সে যখন সংস্কৃত, পারসীক, লাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মাণ এবং ইতালীয়ান প্রভৃতি পৃথিবীর এই আটটি প্রধান ভাষার রত্ন-ভাণ্ডার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছিল এবং যখন তিনি বাল্মীকি, হোমর, ভার্জ্জিল, দান্তে এবং মিল্টন প্রভৃতি মহাকবিদিগকে সুহৃদ্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি তাঁহার শৈশবের সহচর, দরিদ্র কাশীরাম দাস ও

কাব্যানুরক্তি—রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে অনুরাগ

কৃত্তিবাসকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন, তিনি একখানি কাশীদাসী মহাভারত মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছেন। মধুসূদন বেশভূষা এবং আচার-ব্যবহারে সাহেবের ন্যায় থাকিতেন; সুতরাং তাঁহার আত্মীয় ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "একি ! সাহেব লোকের হাতে মহাভারত ?"

মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন, "সাহেব আছি বলিয়া কি বইও পড়িতে দিবে না ? রামায়ণ, মহাভারত আমার কেমন ভাল লাগে, না পড়িয়া থাকিতে পারি না।"

মান্দ্রাজে অবস্থান কালে যখন চর্চ্চার অভাবে তিনি বাঙ্গালাভাষা বিস্মৃত হইতেছিলেন, তখনও তিনি কলিকাতা হইতে রামায়ণ ও মহাভারত আনাইয়া যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। কেবল রামায়ণ, মহাভারত নহে; বাঙ্গালা ভাষার অনেক প্রাচীন কাব্যই তিনি অতি সমাদরের সহিত পাঠ করিতেন, এবং সেই সকল কাব্যের অনেক স্থলই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি তাঁহার স্বদেশীয় কবিগণের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা শিষ্টাচারের জন্য নয়; তাহা প্রকৃতই তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার ও অনুরাগের ফল।

রামায়ণ, মহাভারত পাঠের ফল

রামায়ণ ও মহাভারত পাঠের সহিত মধুসূদনের ভবিষ্যৎ জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। যে মহা-গ্রন্থদ্বয় শত শত বৎসর অবধি হিন্দু নরনারী-দিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে এবং সহস্র সহস্র ভারতসন্তান যাহা হইতে আপন আপন ভাবী মহত্ত্বের বীজ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা মধুসূদনেরও প্রকৃতিদত্ত প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বাল্যে পুনঃ পুনঃ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া তিনি তাঁহার কবিশক্তি-

বিকাশের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আরও কত ভারতীয় কবি যে এরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। লোকের বিশ্বাস, কল্পতরুর নিকট প্রার্থনা করিলে অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দু-সন্তানের পক্ষে সেই কল্পতরু। আমাদিগের জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে এই দুই গ্রন্থ যেরূপ সহায়তা করিয়াছে, ইলিয়াদ্ ভিন্ন আর কোন কাব্য সেরূপ করিয়াছে কি না সন্দেহ। কত অনুতপ্ত হৃদয় ইহা হইতে শান্তিলাভ করিতেছে ; কত শোকজীর্ণ প্রাণ ইহা হইতে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতেছে ; কত স্বদেশবৎসল ইহা হইতে বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম শিক্ষা করিতেছেন ; এবং কত ভাবুক পুরুষ ইহা হইতে কবিশক্তি পরিপোষণের সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন। রাজা পরীক্ষিত ইহা হইতে ঘোর অনুতাপ-যন্ত্রণায় মুক্তি পাইয়াছিলেন ; শিবাজী ইহা হইতে স্বদেশপ্রেম শিক্ষা করিয়াছিলেন ; তুলসীদাস ইহা হইতে ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়াছিলেন ; এবং সেই প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতের সহস্র সহস্র কবি ইহা হইতে আপন আপন কবিশক্তি পরিপোষণের উপযুক্ত উপাদান প্রাপ্ত হইতেছেন। মধুসূদনের প্রকৃতিদত্ত কবিশক্তি বিকাশের পক্ষে যে সকল সামগ্রী অনুকূলতা করিয়াছিল, রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই রামারণ ও মহাভারত পাঠ সম্বন্ধে বাল্মীকি ও বেদব্যাস অপেক্ষা কৃত্তিবাসের ও কাশীদাসেরই নিকট মধুসূদন সমধিক ঋণী ছিলেন। মহর্ষিদ্বয়ের সৃষ্ট চরিত্র হইতে যদিও তিনি তাঁহার কাব্যসমূহের ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার ভাষাজ্ঞান, বর্ণনানৈপুণ্য এবং পুরাণান্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কৃত্তিবাস ও কাশীদাস হইতেই লব্ধ। মেঘনাদবধের ও বীরাঙ্গনার অনেক স্থলেই সেই জন্য ইঁহাদিগের প্রভাব লক্ষিত হইবে।

মধুসূদনের কাব্যানুরক্তির অপর কারণ তাঁহার বাল্য-শিক্ষা। শৈশবে গ্রামস্থ পাঠশালায় তিনি যে শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তিনি পারসীক ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ছাত্রদিগকে তিনি অনেক পারসীক ভাষার কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন, এবং তাহাদিগকে সেই সকল কবিতা কণ্ঠস্থ করিতে বলিতেন। তিনি নিজে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন কি না তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি যে কবিতানুরাগী ছিলেন, তাহা তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয়ে কাব্যানুরাগ সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে। শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে মধুসূদন অল্প বয়সে অনেক পারসী কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, এবং সমবয়সী-দিগকে তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নের সময়ে তিনি পারসী "গজল" গান করিয়া সঙ্গীদিগকে আমোদিত করিতেন।

শৈশব শিক্ষা

মধুসূদনের কাব্যানুরক্তির অপর একটি কারণ তাঁহার সঙ্গীত-প্রিয়তা। বাল্য হইতে কবিতার ন্যায়, গীতবাদ্যের দিকেও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার পিতার ও পিতৃব্যগণের ন্যায় তিনিও আগমনী, বিজয়া-সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে গলদশ্রু হইতেন। অবস্থার কোনওরূপ পরিবর্ত্তনে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের হ্রাস হয় নাই। তাঁহার ব্যারিষ্টার হইয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর, কোন ব্রাহ্মণ একবার তাঁহার নিকট একটি মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ জানিবার জন্য গিয়াছিলেন। মধুসূদনের সঙ্গে ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল এবং তিনি জানিতেন যে ব্রাহ্মণ অতি সুন্দর "সখীসম্বাদ" * গান করিতে পারেন। মধুসূদন মোকদ্দমার কথা

সঙ্গীত-প্রিয়তা

* বিরহ-কাতরা শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণকে সখীদ্বারা প্রেরিত সংবাদ "সখীসম্বাদ" নামে পরিচিত। ইহার কোন কোন সঙ্গীত অতি হৃদয়স্পর্শী। শিক্ষা ও রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইহা ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইতেছে।

রাখিয়া, সখীসম্বাদ শুনিবার জন্য ব্রাহ্মণকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট ক্রমান্বয়ে দশ পনেরটি সখীসম্বাদ শুনিয়া বিনা অর্থ-গ্রহণে তাঁহার মোকদ্দমা সম্বন্ধে উপযুক্ত পরামর্শ দান করিলেন।

জন্মভূমির সৌন্দর্য্য

মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন বুঝিতে হইলে তাঁহার শৈশব-সম্বন্ধীয় যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক, আমরা একে একে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার পিতামাতার কাব্যানুরাগ, তাঁহার শিক্ষকের কবিতাপ্রিয়তা এবং সেই সঙ্গে তাঁহার নিজের রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে এবং সঙ্গীত-শ্রবণে প্রগাঢ় আসক্তি ইত্যাদি যে সকল উপাদানে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়াছিল, আমরা ক্রমে ক্রমে তাহার সকলগুলিরই উল্লেখ করিয়াছি। কেবল তাঁহার কপোতাক্ষী-সলিল-বিধৌতা, গ্রাম্য-সৌন্দর্য্যপূর্ণা জন্মভূমির বিষয় উল্লেখ করি নাই। প্রকৃতি আপন নীরব ভাষায় যে শিক্ষা প্রদান করেন, পৃথিবীর কোন কাব্য বা কোন উপদেষ্টার উপদেশ হইতে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায় না। প্রকৃতির নিত্যনবীন মুখশ্রী যে কত অপ্রেমিককে প্রেমিক ও কত অকবিকে কবি করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। সেইজন্য মধুসূদনের শৈশবের অন্যান্য অনুকূল উপাদানের ন্যায়, তাঁহার জন্মভূমির কথারও উল্লেখ আবশ্যক। প্রকৃতির অতি সৌন্দর্য্যময় নিকেতনে মধুসূদনের শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। এক্ষণে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ভ্রষ্ট-গৌরব হইলেও তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী অতি সুকোমল গ্রাম্য-শোভায় পূর্ণ। নদী, প্রান্তর এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি যে সকল উপাদান লইয়া বঙ্গের পল্লীগ্রামের সৌন্দর্য্য, তাহার কোনটিরই সেখানে অভাব নাই। নির্ম্মলসলিলা কপোতাক্ষী ইহার তিনদিক বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে তাহার উপর অবনত হইয়া পড়িয়াছে। শ্যামল



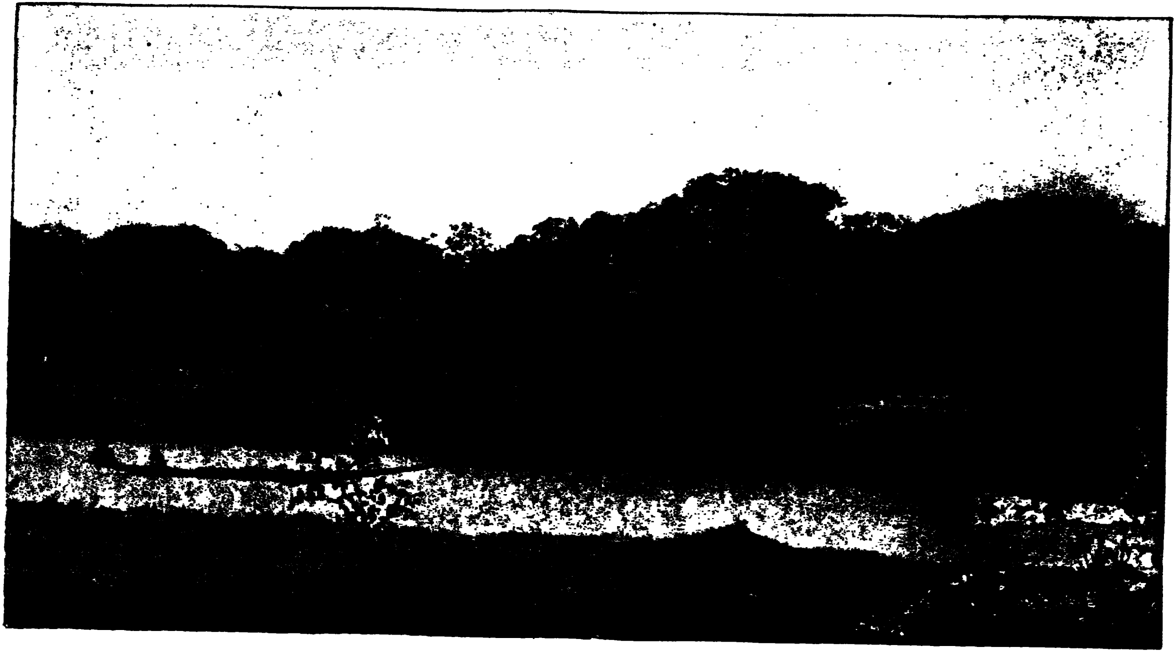
সাগরদাঁড়ীস্থ মধুসূদনের পৈতৃক ভবন

তৃণাচ্ছাদিত ভূমি নদীর তট হইতে জলের রেখা পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। নগরের কৃত্রিমতার সঙ্গে সেখানকার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতি অতি সরল গ্রাম্য-মূর্ত্তিতে সেখানে বিরাজিতা। নদীজলে কুল-ললনাগণ স্নানাবগাহন করিতেছেন; ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকারের তরণী-সমূহ নদীবক্ষে গমনাগমন করিতেছে; কৃষকবনিতাগণ কলসীকক্ষে নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া, একদৃষ্টিতে তাহাদিগের পানে চাহিয়া রহিয়াছে; রাখালবালকগণ পশুপাল ছাড়িয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে; দেখিলে নগরের কোলাহল বিস্মৃত হইয়া সেই সরল গ্রাম্য সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া যাইতে হয়। কপোতাক্ষীর পশ্চিমদিকে দূরপ্রসারিত শ্যামলপ্রান্তর। নদীর উভয় তটে বৃক্ষলতার অন্তরালে স্থানে স্থানে কৃষকদিগের কুটীর; মধ্যে মধ্যে দুই একটি প্রাচীন বট বা অশ্বত্থবৃক্ষ। উদ্যানজ তরুসমূহের ঘনসন্নিবেশে গ্রামটি মধ্যাহ্নকালেও ছায়াপূর্ণ। মধুসূদনের কণ্ঠস্বর নীরব হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার জন্মভূমির বিহগগণের সঙ্গীতের বিরাম হয় নাই। পাপিয়ার গগনপ্লাবী কণ্ঠস্বরে এখনও তাহা পূর্ব্বের ন্যায় দিবারাত্রি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কত অযত্ন-সম্ভূত তরুলতা উদ্যানজ বৃক্ষরাজির সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া গ্রামটিকে আরণ্য-শোভায় অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। মধুসূদনের পৈতৃক বাসভবনের অদূরবর্ত্তী নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া, একবার জ্যোৎস্নালোকে পাপিয়ার দিগন্তপ্লাবী সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে, নিস্তব্ধ গ্রামটির এবং ধীর-বাহিনী কপোতাক্ষীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে অতি নীরস হৃদয়ও কবিজনোচিত সরসভাবে পূর্ণ হয় এবং গ্রামটিকে স্কটের ভাষায় "কবিপুত্রের উপযুক্ত ধাত্রী "Meet nurse for a poetic child বলিতে ইচ্ছা করে। নিদাঘের জ্যোৎস্নালোকে যিনি কপোতাক্ষীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদন যে তাহাকে দুগ্ধ-স্রোতের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই।

খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পর মধুসূদন তাঁহার জীবনের অতি সামান্য অংশই সাগরদাঁড়ীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশের মনোহারিণী মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে চিরজাগরূক ছিল। বাল্যাবস্থায় কোথায় তিনি ক্রীড়া করিতেন, কোথায় বেড়াইতে ভালবাসিতেন, পূর্ণবয়সে তাহা তাঁহার সুস্পষ্টরূপে স্মরণ ছিল। সাগরদাঁড়ীর রাস্তাগুলি পাকা করিয়া বাঁধাইবেন, কপোতাক্ষীতে একটি অবতরণিকা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন এবং তাহার কূলে "মাইকেলোদ্যান" নামক একটি উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া সেখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন, এই তাঁহার বাসনা ছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনের অন্যান্য সহস্র অভিলাষের ন্যায় ইহার কোনটিই পূর্ণ হয় নাই। বহুকাল প্রবাসের পর একবার সাগরদাঁড়ীতে আসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এই মধুমাখা স্থানে আসিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে যাইলে সেরূপ পাওয়া যায় না।" আর একদিন কপোতাক্ষীর কূলে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিয়াছিলেন, "কপোতাক্ষ! যে তোমার তীরে পাতার কুটীরে বাস করিতে পায়, সেও পরম সুখী।" সুদূর ফরাসী-ভূমি হইতে তিনি "কপোতাক্ষ"-কে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন ;—

জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ

"সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।  
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;  
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে  
শোনে মায়া-যন্ত্র-ধ্বনি) তব কলকলে  
জুড়াই এ কাণ আমি ভ্রান্তির ছলনে।  
বঙ্গদেশে দেখিয়াছি বহু নদদলে,  
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে ?  
দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।"



কপোতাক্ষী ও সাগরদাঁড়ীর দৃশ্য

জননী জন্মভূমির মোহিনী মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ গভীর ভাব অঙ্কিত করিয়াছিল, ইহা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। সেই জন্যই আমরা বলিয়াছি, মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন বুঝিতে হইলে তাঁহার শৈশব-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁহার জন্মভূমির কথারও উল্লেখ আবশ্যক।

শৈশবশিক্ষার ফল

মধুসূদন জননী প্রকৃতির নিকট যে অনুকূলতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শৈশবে তাহার কিরূপ ফল ফলিয়াছিল, এইবার আমরা তাহার আলোচনা করিব। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে লোকের প্রতিভা-বিকাশের দিন দিন নূতন নূতন সুযোগ উপস্থিত হইতেছে। এখন কত দ্বাদশবর্ষীয় বালকের লিখিত কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু মধুসূদনের সময়ে দেশের সে অবস্থা ছিল না। যতদিন তিনি দেশে থাকিয়া গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন, ততদিন তাঁহার পক্ষে কবিতা-রচনা দ্বারা নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস প্রদর্শন করিবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা অন্যরূপে প্রকাশিত হইত। তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাল্যকালে তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল, এবং তিনি সঙ্গীত করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অভ্যস্ত গীতির দুই একটি চরণ ভুলিয়া গেলে তিনি নিজে তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। সময়ে সময়ে দুই একটি গান রচনা করিয়া সঙ্গীদিগকে শুনাইতেন, এবং শিক্ষকের নিকট যে সকল পারসী কবিতা অভ্যাস করিতেন, বাঙ্গালায় তাহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আরও একটি অভ্যাস ছিল, তিনি নিজে গল্প রচনা করিয়া সঙ্গীদিগকে শুনাইতেন। পাছে, তাঁহার রচনা বলিয়া বুঝিলে সঙ্গীরা তাঁহার গল্প শুনিতে না চান, সেই জন্য তিনি "ইহা অমুকের নিকট শুনিয়াছি" এইরূপ বলিতেন। এই সকল গল্প এত শীঘ্র ও সুন্দররূপে বলিতেন যে,

তাঁহার সমবয়সীরা কিছুতেই তাহা তাঁহার নিজের রচনা বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না। যে কল্পনা একদিন মেঘনাদ ও বীরাঙ্গনা প্রসব করিয়াছিল, এবং "যাহা অক্লান্তপক্ষ বিহগের ন্যায় স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল কোথাও বিচরণ করিতে ক্রটি করে নাই" * শৈশবে তাহা এইরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

সাধারণ প্রকৃতি

মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন বুঝিবার জন্য তাঁহার শৈশব-সম্বন্ধীয় যাহা কিছু বলিবার আবশ্যক, আমরা তাহার সকলগুলিরই উল্লেখ করিয়াছি; তাঁহার সাধারণ প্রকৃতি বুঝিবার জন্য এই সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব। পূর্ণ-বয়সে মধুসূদন দারুণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন। অকিঞ্চিৎকর সুখের জন্য সামাজিক, নৈতিক কোন প্রকার শাসনই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। অলোকসামান্য প্রতিভা সত্ত্বেও, সেই জন্য তাঁহার জীবন দুঃখময় হইয়াছিল। তাঁহার সমকালীন বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির অভাব ছিল না। কিন্তু মধুসূদনের এবং তাঁহাদিগের মধ্যে এই পার্থক্য ছিল যে, ঘোর কদাচারী হইয়াও তাঁহারা এমনই কৌশলে লোকের চক্ষুতে ধূলি-নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিতে পারিতেন যে, কেহ তাঁহাদিগের কেশাগ্রও দেখিতে পাইতেন না। দোষই হউক বা গুণই হউক, লোকের চক্ষুতে এইরূপ ধূলি-নিক্ষেপ করিবার শক্তি মধুসূদনের কোনকালেই ছিল না। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাঁহার চরিত্রের এই বিশিষ্টতা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইবে। একবার তাঁহার এক পিতৃব্যপুত্র তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া কোন প্রতিবাসীর গাছ হইতে খেজুররস চুরি করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। দুই জনেই গাছে উঠিয়াছেন, এমন সময়ে, যাহার গাছ সে জানিতে পারিয়া তাড়া দিল। মধুসূদনের পিতৃব্যপুত্র

* রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত সাহিত্য-বিষয়ক-প্রস্তাব। ২৭১ পৃষ্ঠা।

অনায়াসে পলাইয়া গেলেন, কিন্তু মধুসূদন গাছের উপর বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন; শেষে বাটীর একজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে গাছ হইতে নামাইয়া লইয়া গেল। পূর্ণবয়সেও তাঁহার কতজন সঙ্গী তাঁহাকে এইরূপে গাছে তুলিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন; মধুসূদনের পলাইবার সামর্থ্য ছিল না; তিনি ধরা পড়িয়া নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা অতি সামান্য, জীবন-চরিতে উল্লেখের অযোগ্য; কিন্তু একগাছি তৃণ ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিলে যেমন বায়ুর গতি নির্ণীত হয়, তেমনিই এইরূপ সামান্য ঘটনা হইতেও অনেক সময়ে মনুষ্যের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় বলিয়াই উল্লেখ করিতেছি।

শিক্ষার্থ কলিকাতায় আগমন

মধুসূদনের ১২।১৩ বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় আনিতে সঙ্কল্প করিলেন। "মহাবিদ্যালয়"* হিন্দুকলেজের গৌরব তখন দেশব্যাপী হইয়াছিল। রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রকে সেই মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইতে মনস্থ করিলেন। পিতার ইচ্ছানুসারে মধুসূদন কলিকাতায় আসিলেন এবং অল্পদিন খিদিরপুরের কোন ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়নের পর, আনুমানিক ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিলেন। নীতিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, মনুষ্যের ভবিষ্যৎ-জীবন গঠনের পক্ষে প্রথম শিক্ষাক্ষেত্র গৃহ, দ্বিতীয় বিদ্যামন্দির। গৃহে পিতামাতার ও আত্মীয়গণের দৃষ্টান্ত দ্বারা মধুসূদনের প্রকৃতির যে অংশ গঠিত হইয়াছিল, আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকদিগের এবং সহাধ্যায়িগণের আদর্শে তাঁহার অপর অংশ যেরূপ গঠিত হইয়াছিল, এইবার তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রসিদ্ধ ইংরাজী সন্দর্ভ-লেখক আডিসন বলিয়াছেন, শিক্ষাশূন্য হৃদয় এবং আকরস্থ প্রস্তর দুই

* প্রাচীন হিন্দুকলেজ "মহাবিদ্যালয়" নামেও অভিহিত হইত।

সমতুল্য। উপমাটি আরও একটু পরিস্ফুট করিলে বোধ হয় বলা অসঙ্গত হইবে না যে, শিক্ষাশূন্য হৃদয় প্রস্তর এবং বিদ্যামন্দির ভাস্করালয়। কত অসংস্কৃত প্রস্তর যে এই ভাস্করালয় হইতে দেবমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। সেই জন্য আমরা মধুসূদনের সম্বন্ধিনী কথার সঙ্গে যে কারু-গৃহে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়াছিল, তাহারও কথা আলোচনা করিব।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## হিন্দুকলেজ—শিক্ষাবস্থা

[ ১৮৩৭-৪০ খৃষ্টাব্দ ]

মধুসূদন শিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন, তাহার অস্তিত্ব লোপ হইলেও তাহার নাম এক্ষণে শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেরই পরিচিত। বঙ্গদেশ আজ যাঁহাদিগের কার্য্যকলাপে গৌরবান্বিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বারকানাথ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুকলেজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, চরিত্রে এবং বিদ্যায় ইঁহারা বঙ্গদেশের গৌরবস্থল। মধুসূদন যখন হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিলেন, তখন ইহার পূর্ণ যৌবনাবস্থা। ছাত্রদিগের ও শিক্ষকগণের গৌরবে হিন্দুকলেজ তখন বঙ্গদেশের বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ পারদর্শী কাপ্তেন রিচার্ডসন, গণিতশাস্ত্রবিদ্ রিজ, ভাষা-তত্ত্ববিদ্ হ্যালফোর্ড এবং ক্লিণ্ট প্রভৃতি সে সময়কার প্রসিদ্ধনামা অধ্যাপকগণ ইহাতে অধ্যাপনা করিতেন। জোন্স্ সাহেব স্কুল বিভাগের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এবং স্বর্গীয় রামচন্দ্র মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এক এক বিষয়ে এক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন; সুতরাং মধুসূদন সে সময়ে এদেশের পক্ষে যতদূর সম্ভবপর, ততদূর উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

*হিন্দুকলেজ ও তাহার শিক্ষকগণ*

কলেজীয় শিক্ষা ও গৌরবলাভ

কলেজে প্রবেশ করিয়াই মধুসূদন একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীতেই তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন, এবং যাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, অথবা তাঁহার পূর্ব্বে কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কোন সহাধ্যায়ী তাঁহার শিক্ষাবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন ;—"যত্ন ও পরিশ্রমগুণে আমিও হিন্দুকলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণনীয় হইয়াছিলাম, কিন্তু মধু আমাদিগের ভিতর ঔজ্জ্বল্যে তারকামণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় ছিল।"* তাঁহার আর একজন সহাধ্যায়ী লিখিয়াছেন ;—"বয়সে মধুসূদন আমা অপেক্ষা ছোট ছিল, কিন্তু এমনই তাহার বিদ্যাবুদ্ধির জোর যে, আমাদিগের অনেক পরে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিয়া, লম্ফে লম্ফে নিম্নশ্রেণী সকল অতিক্রম করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সে আমাদের সমাধ্যায়ী হইয়াছিল।" † মধুসূদন যখন হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন ইহা দুইভাগে বিভক্ত ছিল। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত "সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্ট" এবং ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী পর্য্যন্ত "জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্ট" নামে অভিহিত হইত। যদিও সর্ব্বশুদ্ধ অনেকগুলি শ্রেণী ছিল, তথাপি উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা একেবারে দুই তিন শ্রেণী উপরে উঠিতে পারিতেন বলিয়া কাল-বিলম্বের অসুবিধা তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হইত না ; এবং সেই জন্যই মধুসূদন অতি অল্প সময়ের মধ্যে কলেজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারিয়াছিলেন।

* "I was a very dull boy at the commencement, but by diligence and exertion became one of the stars of the College of which Madhu was the Jupiter." মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ও বাল্যসুহৃদ্ বঙ্কুবিহারী দত্ত মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

† নবজীবন ১২৯৪, পৌষ, ৩৪৩ পৃষ্ঠা।

তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন, এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কলেজ ত্যাগ করেন। হিন্দুকলেজের সিনিয়ার বিভাগের বা উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য বর্ত্তমান বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে না; সুতরাং মধুসূদন ১৮৩৭ হইতে ১৮৪২ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক এই ছয় বৎসরের মধ্যে যে প্রায় ইংরাজী বর্ণশিক্ষা হইতে বি. এ. শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, ইহা তাঁহার সুতীক্ষ্ণবুদ্ধির ও মেধাবিত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। তিনি যে বৎসর হিন্দুকলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই বৎসর ( ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ) সিনিয়ার ও জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার নিয়ম প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা সিনিয়র বৃত্তি, এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিতেন। মধুসূদন পঞ্চম শ্রেণী হইতেই জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনেক ছাত্রকে অতিক্রম পূর্ব্বক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে যেমন অনেক প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তেমনই অনেক প্রতিভাবান্ ছাত্রও সেখানে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্ত্তী ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন।

সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্ত্তী ছাত্রগণ

স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকার, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু এবং ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতি হিন্দুকলেজের অনেক খ্যাতনামা ছাত্র এই সময় কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র এবং রাজদত্ত সম্মান প্রভৃতির জন্য ইঁহাদিগের অনেকেরই নাম বঙ্গসমাজে পরিচিত হইয়াছে। রাজনারায়ণবাবুর ও ভূদেববাবুর নাম বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণেরও সুপরিচিত। বঙ্গভাষায় ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইঁহাদিগের লেখনী-প্রসূত। নানা

বিষয়ে বঙ্গসমাজ ইঁহাদিগের নিকট যে ঋণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইবার নয়।

শিক্ষাবিবরণ

মধুসূদন যে এইরূপ প্রতিষ্ঠাবান্ ছাত্রগণের মধ্যে "ঔজ্জ্বল্যে তারকা-মণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় ছিলেন," ইহা তাঁহার প্রতিভার পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নয়। তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সুহৃৎ বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার ছাত্রাবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—"কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্যূন কুড়ি লক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আর কাহাতেও কখন দেখি নাই।"

গ্রামস্থ পাঠশালায় অধ্যয়ন করিবার সময়ে মধুসূদনের চরিত্রে যে সকল গুণ লক্ষিত হইত, হিন্দুকলেজের শিক্ষায় তাহা সম্যক্‌রূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিদ্যোপার্জ্জনে অনুরাগ, অধ্যয়নাসক্তি এবং উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি তাঁহার শৈশবের গুণগুলি কলেজীয় শিক্ষায় আরও অধিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। পাঠশালার কোন ছাত্র লেখাপড়ায় তাঁহাকে অতিক্রম করিলে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না ; কলেজেও যাহাতে তাঁহার কোন সহাধ্যায়ী তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি পরিশ্রম করিতে ক্রুটী করিতেন না। কীটের ন্যায় কেবলই গ্রন্থমধ্যে আবদ্ধ থাকিবার অভ্যাস তাঁহার কোনকালেই ছিল না। স্বভাবতঃ তিনি রহস্যপ্রিয় ছিলেন, এবং সহাধ্যায়িগণের সহিত আমোদ, কৌতুক ইত্যাদি পূর্ণমাত্রায় করিতেন। কিন্তু লেখাপড়া করিতে বসিলে আমোদ, আহ্লাদ কিছুই তাঁহার মনে থাকিত না। বিষয়বিশেষে মনঃসংযম করিবার শক্তিও তাঁহার অসাধারণ ছিল। পড়িতে আরম্ভ করিলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা সমস্তই তিনি বিস্মৃত হইতেন। কলেজের মধ্যে একজন বহুগ্রন্থপাঠী ছাত্র বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে তিনি ইংরাজী-সাহিত্য-

সম্বন্ধে এত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্রও তত পাঠ করেন কি না সন্দেহ। পাঠ্যাবস্থায় সাহিত্যেরই দিকে তাঁহার অধিক অনুরাগ ছিল ; এবং অন্য বহু সাহিত্যসেবীর ন্যায় তিনিও সাহিত্যের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ-বশতঃ গণিত-চর্চ্চা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন। নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে তাঁহার গণিতে বিরাগ ছিল না ; বরং অন্য কেহ তাঁহাকে গণিতে অতিক্রম করিলে তিনি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া যতই তিনি সাহিত্যের আলোচনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার গণিতের প্রতি অশ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। গণিতের সময়ে হয় তিনি কোন উপন্যাস বা কাব্য পড়িয়া কাটাইতেন, না হয় একেবারেই স্বশ্রেণীতে উপস্থিত থাকিতেন না। গণিতের প্রতি তাঁহার এইরূপ বিরাগ সম্বন্ধে কিন্তু একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেকে এমন আছেন যে, গণিতে কিছুতেই তাঁহাদিগের বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না, এবং সহস্র চেষ্টা করিলেও তাঁহাদিগের মস্তিষ্ক গণিতের জটিলতা ভেদ করিতে পারে না। মধুসূদন এ শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন না। গণিতে যে তাঁহার বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হইত না, তাহা নয় ; ভাল লাগিত না বলিয়া স্বেচ্ছাক্রমেই তিনি গণিতানুশীলন ত্যাগ করিয়াছিলেন ; কিন্তু যে দিন ইচ্ছা হইত, তাহাতে এমনই পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেন যে, সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একদিনের একটি ঘটনা উল্লিখিত হইতেছে। প্রসিদ্ধনামা রিজ্ সাহেব হিন্দুকলেজের গণিতাধ্যাপক ছিলেন।* গণিত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। যাঁহারা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, তাঁহার ন্যায় গণিতজ্ঞ ব্যক্তি

* ইনি সম্রাট্ প্রথম নেপোলিয়নের ধ্বজা-বাহক ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

এদেশে অতি অল্পই আসিয়াছেন। মধুসূদনের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ছাত্রকে গণিতানুশীলন ত্যাগ করিতে দেখিয়া, তিনি প্রথমে অনেক বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, মধুসূদন কিছুতেই গণিতাধ্যয়নে প্রস্তুত নহেন, তখন নিরাশ্বাস হইয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে আর কোন কথা বলিতেন না। একদিন তিনি এমনই একটি দুরূহ প্রশ্ন দিলেন যে, গণিতে বিশেষ পারদর্শী ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ তাহার উত্তর করিতে সমর্থ হইলেন না। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে মধুসূদনের ও তাঁহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে সেক্সপীয়ার ও নিউটন উভয়ের মধ্যে প্রতিভায় কে শ্রেষ্ঠ, এই কথা লইয়া তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও আরও দুই একজন গণিত-পক্ষপাতী ছাত্র নিউটনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। মধুসূদন সাহিত্য-সেবক, তিনি সেক্সপীয়ারের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"সেক্সপীয়ার চেষ্টা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন, কিন্তু নিউটন চেষ্টা করিলে কখনও সেক্সপীয়ার হইতে পারিতেন না।" এই কথার পর হইতে মধুসূদন যে গোপনে গোপনে অঙ্ক কসিতে শিখিতেছিলেন, তাঁহার সহাধ্যায়িরা কেহ তাহা জানিতেন না। এক্ষণে রিজ্ সাহেবের প্রশ্নে অপর সকলকে অধোমুখ দেখিয়া মধুসূদন অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করিলেন। ভূদেববাবু অল্পক্ষণ পরেই দেখিলেন মধুসূদন অঙ্কটি কসিয়া প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া রিজ্ সাহেবকে বলিলে, রিজ্ সাহেব মধুসূদনকে স্কুলের বোর্ডে সকলের সমক্ষে অঙ্কটি কসিতে বলিলেন। মধুসূদন অতি সুন্দর প্রণালীক্রমে অঙ্কটি কসিয়া আসিলেন এবং ভূদেববাবুর গা টিপিয়া তিন মাস পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন,—"কেমন, সেক্সপীয়ার চেষ্টা করিলে যে নিউটন হইতে পারিতেন তাহা দেখিলে ত? কিন্তু আমার গণিত শেখা এই পর্য্যন্ত শেষ।"

গণিত ও সাহিত্য

ইংরাজী রচনার অভ্যাস

অধ্যয়নাবস্থায় মধুসূদন যে কেবল একজন বহুগ্রন্থপাঠী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন তাহা নয়; কলেজের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী-লেখক ছাত্র বলিয়াও প্রতিপত্তি-লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী-রচনায় তাঁহার সমকক্ষ ছাত্র কলেজের মধ্যে অতি অল্পই ছিলেন। সভাসমিতিতে রচনা-পাঠ করা এবং সংবাদপত্রে লেখা তখনকার ছাত্রদিগের মধ্যে বহুল প্রচলন ছিল। কি শিক্ষক, কি অভিভাবক, সকলেই ছাত্রদিগকে এ সম্বন্ধে উৎসাহ দান করিতেন। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেরই কোন না কোন সংবাদপত্রের সহিত সম্বন্ধ ছিল। নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরা সেরূপ সুযোগের অভাবে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের অনুকরণে হস্তলিখিত সংবাদপত্রের প্রচার দ্বারা গ্রন্থকার হইবার বাসনা চরিতার্থ করিতেন। মধুসূদন ও তাঁহার হিন্দু-স্কুলস্থ সহাধ্যায়িগণ একত্রে এইরূপ একখানি হস্তলিখিত সংবাদপত্র প্রচার করিতেন। এই পত্রখানি তিন চার মাস চলিয়াছিল। কাপ্তেন রিচার্ডসন নবীন লেখকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রতি সপ্তাহে ইহা নিয়ম মত পাঠ করিতেন। কিন্তু বালক-বালিকার ধূলি-খেলার সংসার যেমন দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সংসারে পরিণত হয়, মধুসূদনের সেই বাল্যক্রীড়াও তেমনই অল্পদিনের মধ্যে প্রকৃত ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। ইহার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একখানি সংবাদপত্রে লিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষক বাবু রামচন্দ্র মিত্র এই সময়ে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। মধুসূদনের কোন সহাধ্যায়ী তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্য, সংবাদ ইত্যাদি লিখিতেন। মধুসূদন তাহা অবগত হইয়া জ্ঞানান্বেষণে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার লিখন-প্রণালীতে প্রীত হইয়া সম্পাদক তাঁহার লিখিত বিষয়গুলি আহ্লাদ সহকারে প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্তদশবর্ষ

বয়সে হিন্দুকলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে মধুসূদনের সম্বন্ধ আরব্ধ হইল।

বিদ্যানুশীলনে অনুরাগের ন্যায় মধুসূদনের স্বাভাবিক প্রেমপ্রবণতা এবং পরদুঃখকাতরতাও কলেজে অধ্যয়নাবস্থায়, তাঁহার প্রকৃতিতে সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছিল। রাজপথের রোরুদ্যমান ভিক্ষুক বালক ও দারিদ্র্য-পীড়িত সহাধ্যায়ী ছাত্র উভয়েরই অভাব মোচনে বালক মধুসূদন সমভাবে তৎপর ছিলেন। পিতামাতার অনুগ্রহে তাঁহার অর্থাভাব ছিল না; বিপন্নের সেবায় ব্যয় করিয়া তিনি অনেক সময় পিতৃদত্ত অর্থের সার্থকতা করিতেন। কিন্তু দানশীলতা অপেক্ষা প্রেমপ্রবণতাই তাঁহার চরিত্রের সমধিক উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, তিনি যেমন প্রেমপ্রবণ ও স্নেহার্দ্রহৃদয় ছিলেন, অতি অল্প লোকই সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার সহাধ্যায়ী সুপ্রসিদ্ধ "Travels of a Hindu" নামক গ্রন্থপ্রণেতা বাবু ভোলানাথ চন্দ্র বলেন—"Madhu fully justified his name—he was all—মধু—all that endeared one to another",—বাল্যবন্ধুদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়াই ভালবাসিতেন।

প্রেমপ্রবণতা

ডিস্‌রেলী যথার্থই বলিয়াছেন, "মানুষ পূর্ণবয়সে যতই ভালবাসুন, বাল্যবন্ধুতার উল্লাস অথবা অবসাদ কখনও প্রাপ্ত হইতে পারেন না। জীবনের কোন সুখ বাল্যবন্ধুতার সুখের ন্যায় হৃদয় পূর্ণ করে না; ঈর্ষা অথবা নৈরাশ্যের কোন যন্ত্রণা এমন নিষ্পেষক অথবা মর্ম্মভেদী বলিয়া বোধ হয় না। বাল্যবন্ধুতায় যে মধুরতা, যে আত্মবিসর্জ্জন, পরস্পরের প্রতি যে অসীম বিশ্বাস, বিরহে যে তীব্রতা, এবং পুনর্ম্মিলনে যে দ্রবীভাব, অপর কোন বয়সের প্রণয়ে তাহা ঘটিবার নয়।" বাল্যবন্ধুতার

নৈরাশ্যে কত হৃদয় যে নিষ্পিষ্ট এবং কত আশা যে বিশুষ্ক হইয়া যায়, তাহার সংখ্যা নাই। বাল্যবন্ধুতা হইতে অনেকের ভবিষ্যৎ জীবনেরও আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। লর্ড বায়রণ তাঁহার বাল্যবন্ধুতার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"My school-friendships were with me passions." এই প্রেম-পিপাসু বালক বায়রণের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রেমপিপাসু বালক মধুসূদনেরও বাল্যবন্ধুতার আলোচনা করিলে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। পাঠদ্দশায় যাঁহাদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং বাবু গৌরদাস বসাকের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।* মধুসূদন এই সময় গৌরদাসবাবুকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার বাল্যপ্রেমের প্রগাঢ়তা, অধ্যয়নাসক্তি, উচ্চাভিলাষ, স্বেচ্ছাচারপ্রিয়তা এবং উদ্দাম ঔদ্ধত্য প্রভৃতি দোষ, গুণ অনেক জানিতে পারা যায়; কিন্তু পত্রগুলি ইংরাজীতে লিখিত বলিয়া আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে নিরস্ত হইলাম। কৌতূহলী পাঠক মধুসূদনের বিস্তৃত জীবন-চরিতে তাহা দেখিতে পাইবেন।

মধুসূদনের শিক্ষাবস্থা সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক।

আত্মসংযম ও সুনীতির অভাব

অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াও তিনি যে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন নাই, আত্মসংযমের ও নীতি-পরায়ণতার সম্বন্ধে

* ভক্তিভাজন ভূদেববাবুর নাম বঙ্গের কৃতবিদ্যমাত্রেরই পরিচিত; সুতরাং তাঁহার পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। বাবু গৌরদাস বসাকেরও নাম সাধারণের অবিদিত নয়। ইনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বসাকবংশীয়। হিন্দুকলেজের পাঠ সমাপন করিয়া ইনি বহুদিন যোগ্যতার সহিত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং কলিকাতার একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ও আসিয়াটিক সোসাইটির একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

ঔদাসীন্যই তাহার প্রধান কারণ। তাঁহার সর্ব্বনাশের বীজ পঠদ্দশাতেই তাঁহার চরিত্রে উপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা ওকালতী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, সুতরাং মধুসূদনের অর্থাভাব ছিল না। একমাত্র সন্তান বলিয়া তাঁহার জননী তাঁহাকে ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ দিতেন। সুতরাং মধুসূদন বেশভূষায় ও ব্যয় সম্বন্ধে কলেজের লক্ষ-পতির সন্তানদিগেরই ন্যায় চলিতেন। হিন্দুকলেজ প্রধানতঃ ধনিসন্তান-দিগেরই জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনবান্ পরিবারের বালকেরাই তথায় অধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং বিলাসপ্রিয়তা হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে বড়ই সাধারণ ছিল। এই বিলাস-প্রিয়তা সম্বন্ধে মধুসূদন আবার অপর সকলের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। নিত্য নূতন নূতন পরিচ্ছদ এবং নূতন নূতন গন্ধদ্রব্য না হইলে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইত না। অতি অকিঞ্চিৎকর কার্য্যেও তিনি সময়ে সময়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার একদিনের ব্যবহার হইতে তাঁহার প্রকৃতি অনুমান করিতে পারা যায়। একদিন সাহেব-ক্ষৌরকারের দোকান হইতে চুল ছাঁটিয়া আসিয়া মধুসূদন সহাধ্যায়ী-দিগকে বলিলেন,—"দেখ, আমার কেমন সুন্দর চুল ছাঁটা হইয়াছে, আমি ইহার জন্য এক মোহর দিয়াছি।" কিন্তু এই বিলাসপ্রিয়তা অপেক্ষা গুরুতর আরও কোন কোন দোষ এই সময়ে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, এবং সেই সকল দোষই পরিণামে তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার সমকালবর্ত্তী হিন্দুকলেজের আরও বহু ছাত্র পঠদ্দশায় তাঁহারই ন্যায় দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছিলেন। তবে তাঁহারা একবার স্খলিতপদ হইয়া আবার উঠিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে মধুসূদন তাহা পারেন নাই।

অধ্যয়নাবস্থায় মধুসূদনের চরিত্রে যে সমস্ত দোষ গুণ পরিস্ফুট হইয়াছিল, আমরা একে একে তাহা আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার

অধ্যয়নশীলতা, সাহিত্যানুরাগ, প্রেম-প্রবণতা, বিলাসিতা প্রভৃতি সমুদায়ই উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু যে শিক্ষা তাঁহাকে "কবি মধুসূদন" করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। কবি-শক্তি মনুষ্যের প্রকৃতি-দত্ত গুণ ; সুতরাং হিন্দুকলেজের শিক্ষায় মধুসূদন যে তাঁহার কবিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নয়। তবে হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা হইতে তাঁহার প্রকৃতি-দত্ত শক্তি যে স্ফূর্ত্তিলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিব।

# তৃতীয় অধ্যায়

## শিক্ষাবস্থা—১৮৪১-৪২ ; কবিতা-রচনার অভ্যাস

হিন্দুকলেজের প্রসিদ্ধনামা শিক্ষক কাপ্তেন ডি. এল্. রিচার্ডসনের প্রদত্ত শিক্ষাই মধুসূদনের কবিশক্তি-বিকাশের প্রধান সহায় হইয়াছিল। রিচার্ডসনের নাম ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু তিনি যে এক সময়ে এদেশের বিদ্বন্মণ্ডলীর কিরূপ সমাদর-ভাজন ছিলেন, এবং এদেশের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবনগঠনে কিরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, এখন তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। তিনি প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে সৈনিক-কার্য্যে ব্রতী হইয়া এদেশে আগমন করেন, এবং সৈনিক-কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ হইতেই তিনি সাধারণের নিকট কাপ্তেন রিচার্ডসন নামে খ্যাত। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা সাহিত্যেরই দিকে ছিল। কিছুদিন সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিবার পর, তিনি কোম্পানির অধীনতা ত্যাগ করেন, এবং অল্পদিন ভারতের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা মহাত্মা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সহচারিত্ব করিয়া ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কার্য্য করিবার সময় হইতেই তিনি একজন সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়কার ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় অনেক প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তদ্ভিন্ন কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক প্রণয়ন ও সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদন দ্বারা তাঁহার নাম তাঁহার স্বদেশীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীরও পরিচিত হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার নিজের রচনাশক্তি অপেক্ষা

অন্যের রচনার দোষ, গুণ নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতার জন্যই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রকৃত কবি-কৌলীন্য উপলব্ধি করিবার তাঁহার ন্যায় শক্তি অতি অল্প লোকের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার ছাত্র-দিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, কাব্যশাস্ত্রের রসাস্বাদ ও অর্থগ্রহণ করিতে রিচার্ডসনের ন্যায় সুনিপুণ অধ্যাপক এদেশে অতি অল্পই আসিয়াছেন। তাঁহার অধ্যাপনা-প্রণালীও অতি চমৎকার ছিল। যে গ্রন্থ তিনি অধ্যাপনা করিতেন, তাহার দুরূহ অংশ সমূহ তিনি এরূপ নৈপুণ্যের সহিত পাঠ করিতে পারিতেন যে, তাঁহার একবার আবৃত্তি মাত্র, ছাত্রদিগের অনেক স্থলে তাহার অর্থগ্রহ হইত। সুপ্রসিদ্ধ লর্ড মেকলে তাঁহার সেক্স্‌পীয়ার আবৃত্তি সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিলে, ভারতের আর সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইতে পারি, কিন্তু তোমার সেক্স্‌পীয়ার-আবৃত্তি বিস্মৃত হইতে পারিব না।" আধুনিক অনেক অধ্যাপকের ন্যায় তিনি কেবল দুরূহ শব্দের বা দুর্ব্বোধ্য পদের ব্যাখ্যা করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন না, ছাত্রদিগের মনোবৃত্তির যাহাতে উন্মেষ হয়, তজ্জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতেন। তিনি তাঁহাদিগের ভাবগ্রাহিতার উদ্দীপন করিবার জন্য তাঁহাদিগের সম্মুখে বাহ্যজগতের ও অন্তর্জগতের গূঢ় সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিতেন এবং তাঁহাদিগকে বলিতেন, "দেখ, এই বাহ্যজগৎ কেমন সুন্দর! কেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ! এই নক্ষত্র-মণ্ডিত আকাশ, এই তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্র, এই সৌন্দর্য্যময় প্রদোষ, এই বাসন্ত-কুসুম-সজ্জিত উপবন কি অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত! পতির নিকট সতীর ন্যায় প্রকৃতি কবিগণেরই নিকট আপনার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করেন। সাধারণের নিকট প্রকৃতির যে মূর্ত্তি শুষ্ক ও কঠোর বলিয়া বোধ হয়, কবির নিকট তাহা সরস ও লালিত্যময় প্রতীয়মান হয়। তোমরা কবি হও, বাহ্যজগতের অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। সেই সঙ্গে

মানব-হৃদয়েরও গূঢ় রহস্য আলোচনা করিতে শিক্ষা কর।* অপমানিত মানব-হৃদয় প্রতিহিংসায় কি পিশাচমূর্ত্তি ধারণ করে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ সাইলকে ; ভবিষ্যতে কি ঘটিবে চিন্তামাত্র না করিয়া প্রেমিক কেমন পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ রোমিও ও জুলিয়েটে ; প্রণয়িনীর উপর সন্দেহ জন্মিলে প্রণয়ী কিরূপ উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য করে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখ ওথেলোয়। এই বাহ্যজগতের ও অন্তর্জগতের রহস্যভেদ করিতে না পারিলে, তোমাদিগের শিক্ষার সার্থকতা হইবে না। দেখ, যে মহাকবিগণ এই অপ্রত্যক্ষ জগৎ বর্ণনা গুণে তোমাদিগের প্রত্যক্ষ করাইতেছেন, তাঁহাদিগের কি সৃষ্টিনৈপুণ্য, কি রচনাকৌশল ! যদি সুলেখক হইতে চাও, তবে ইঁহাদিগকে আদর্শ কর। এইরূপ শব্দবিন্যাস এবং এইরূপ ভাষার পারিপাট্য না হইলে রচনার উৎকর্ষ হয় না।" এরূপ শিক্ষাদানে যে ফল প্রত্যাশা করা

* তাঁহার সারসংগ্রহের ভূমিকায় রিচার্ডসন লিখিয়াছেন :—

To cold and vulgar minds how large a portion of this beautiful world is a dreary blank ! They recognise nothing but an uninteresting monotony in the daily aspect of the earth or sky. It is the spirit of poetry which keeps the world fresh and young. To a poetical eye every morning's sun seems to look rejoicingly on a new creation. Poetry widens the sphere of our purest and most permanent enjoyments. It makes the familiar new, the past present, the distant near. It is the philosopher's stone discovered ; it transmutes everything into gold.

তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন—

It is the part of poetry to lift us above the reach of petty cares and sensual desires, and to make us feel that there is something nobler and more permanent than the ordinary pleasure of the world. It is a species of religion. Poets are nature's priests. They lead us "from nature up to nature's God".

যাইতে পারে তাহাই ফলিয়াছিল। রিচার্ডসনের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকে সুপণ্ডিত ও সুলেখক হইয়াছিলেন।

রিচার্ডসন অনেক বিষয়ে তাঁহার ছাত্রদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে তাঁহার ছাত্রগণের হৃদয়ে ইংরাজী ভাষায় গদ্য, পদ্য রচনা করিবার প্রবৃত্তি উদিত হইত। অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকগণের রচনার ন্যায় তাঁহার নিজের রচনাও তিনি অনেক সময় ছাত্রদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার সুললিত কবিতায় ও হৃদয়গ্রাহিণী আবৃত্তিতে তাঁহার ছাত্রগণের হৃদয় সহজেই মুগ্ধ হইত। তাঁহারাও আশা করিতেন "কতদিনে কাপ্তেন সাহেবের" ন্যায় সুলেখক হইতে পারিবেন। রিচার্ডসনও ছাত্রদিগের এই আশা যাহাতে পূর্ণ হয়, তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। তিনি তাঁহাদের রচনা অতি যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া দিতেন, এবং তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট রচনাগুলি কোন সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ করাইতেন। এরূপ সাহায্য ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে, ছাত্রদিগের উচ্চাভিলাষ এবং রচনা-প্রবৃত্তি সহজেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কাপ্তেন সাহেবের ন্যায় সুলেখক হইব, রিচার্ডসনের ছাত্রমাত্রেরই হৃদয়ে এই বাসনা প্রবল ছিল। অন্যান্য ছাত্রেরা রিচার্ডসনের কেবল গুণগুলিরই অনুকরণ করিতেন; কিন্তু মধুসূদন তাঁহার দোষগুলি পর্য্যন্ত অনুকরণ করিতে ছাড়িতেন না। তাঁহার কোন সহাধ্যায়ী বলেন—"একদিন মাধ্যাহ্নিক ছুটির সময়ে যখন কলেজের অন্যান্য ছাত্রেরা আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, মধুসূদন তখন একা গৃহের এক নির্জ্জন অংশে বসিয়া রিচার্ডসনের বাঁকা বাঁকা হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতেছিলেন। স্কুল-বিভাগের প্রথম শিক্ষক জোন্স্ সাহেব দেখিতে পাইয়া তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মধুসূদনকে তদ্গতচিত্তে রিচার্ডসনের

রিচার্ডসনকে অনুকরণেচ্ছা

লেখার অনুকরণ করিতে দেখিয়া, তিনি হাসিয়া বলিলেন—"মধু, তুমি কি মনে কর কাপ্তেন সাহেবের মত বাঁকা বাঁকা হাতের লেখা হইলে তুমি একজন বড় লোক হইবে?" মধুসূদন লজ্জায় নিরুত্তর রহিলেন এবং ব্যস্ততার সহিত লিখিত বিষয়টি লুকাইয়া ফেলিলেন। রিচার্ডসনকে অনুকরণ করিবার ইচ্ছা মধুসূদনের কিরূপ প্রবল ছিল, এই ঘটনা হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে। মধুসূদন যখন পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময়ে রিচার্ডসনের "সারসংগ্রহ পুস্তক" প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভূমিকা অতি উপাদেয়। কাব্যানুশীলনের দোষ, গুণ রিচার্ডসন তাহাতে অতি সুন্দররূপে আলোচনা করিয়াছেন। মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে তিনি তাহা তাঁহার ছাত্রগণের নিকট পাঠ করিয়াছিলেন। মধুসূদন শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন এবং মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, সকলের সমক্ষেই বলিয়া উঠিলেন—"আহা, আমি যদি ইহার লেখক হইতাম" ("I wish I had been the author of it")। সেই সুকুমার বয়সে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মধুসূদনের কিরূপ উচ্চাভিলাষ জন্মিয়াছিল, তাঁহার এই মন্তব্য হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া যে কবিত্ববীজ মধুসূদনের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, রিচার্ডসনের প্রদত্ত শিক্ষায় ও আদর্শে তাহা এইরূপে উদ্ভিন্ন হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। কলেজের অতি নিম্নশ্রেণী হইতে মধুসূদন ইংরাজীতে গদ্য পদ্য রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও তাঁহার পূর্ণ বয়সের রচনার সহিত তাঁহার বাল্য রচনার বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তথাপি তাঁহার সাহিত্যিক জীবন কিরূপে আরব্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেই সকল কবিতা হইতে তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। পূর্ণবয়সে তিনি মিল্টনকে তাঁহার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু পঠদ্দশায় বায়রণই তাঁহার আদর্শ ছিলেন। বায়রণ, স্কট্ এবং

মূর এই তিন জনেরই আদর্শে তিনি তখন তাঁহার রচনাপ্রণালী গঠিত করিয়াছিলেন। তিনি ইঁহাদিগের অনুকরণে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাঁহার "ক্যাপটিভ্ লেডী" ও এই সময়কার লিখিত কবিতাগুলি পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ না হইলেও ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠক সেই সকল কবিতা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষিত এবং অষ্টাদশ-বর্ষ বয়স্ক একজন যুবকের পক্ষে বিদেশীয় ভাষায় সেরূপ কবিতা লেখা সামান্য প্রতিভার পরিচায়ক নয়। কবিশক্তি মনুষ্যের অতি দুর্ল্লভ গুণ; দেবানুগ্রহ ভিন্ন ইহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। বাগ্‌দেবতা মধুসূদনকে এই দুর্ল্লভ শক্তি এরূপ মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন যে ভাষা শিক্ষা করিতেন অতি অল্পায়াসেই তাহাতে কবিতা লিখিতে পারিতেন। আলেক্‌জন্দার পোপ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, মধুসূদনের সম্বন্ধে বোধ হয় তাহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রকৃতই তিনি

বায়রণ, স্কট্ এবং মূরের প্রভাব

"Lisped in numbers for the numbers came."

পোপের ন্যায় তিনিও বাল্যসুহৃদ্‌দিগকে কবিতায় পত্র লিখিতেন এবং কবিতা রচনা করিয়া উপহার দিতেন। কোন একটি বস্তু চাহিবার বা প্রত্যর্পণ করিবার সময়ে তিনি বাল্যবন্ধুদিগের নিকট কখন কখন কবিতাতেই মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। অবশ্য এরূপ কবিতায় কোন বিশেষ সৌন্দর্য্য থাকা সম্ভবপর নয়; কিন্তু সৌন্দর্য্য না থাকুক, যিনি পূর্ণ বয়সে মেঘনাদবধ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার কিশোর বয়সের সেই কবিতা-ক্রীড়া দেখিলে পাঠক অবশ্যই কৌতুক লাভ করিবেন।

মধুসূদনের এই সময়কার পত্র অথবা কবিতা যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সমস্তই ইংরাজীতে লিখিত। বাঙ্গালা ভাষারই সঙ্গে

মধুসূদনের নাম চিরদিন গ্রথিত থাকিবে; সুতরাং তাঁহার ইংরাজী রচনা অপেক্ষা শৈশবের বাঙ্গালা রচনা পাঠ করিতেই পাঠকগণের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের সে আগ্রহ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষার কিছুমাত্র অনুশীলন করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষা অশিক্ষিত ও বর্ব্বরের ভাষা এবং তাহা বিস্মৃত হওয়াই ভাল, হিন্দুকলেজের অন্য অনেক ছাত্রের ন্যায় তাঁহারও এই সংস্কার ছিল। একবার মাত্র তিনি তাঁহার প্রিয়-সুহৃদ্ গৌরদাসবাবুর অনুরোধে বর্ষাঋতু-বর্ণনা-প্রসঙ্গে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বর্ত্তমান সংস্করণে প্রকাশের যোগ্য নয়।

প্রথম বাঙ্গালা কবিতা

তাঁহার সমকালবর্ত্তী অন্যান্য অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় মধুসূদনও মনে করিতেন, ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলন ও ইংরাজী-ভাষায় গ্রন্থ-রচনা দ্বারাই যশ ও অর্থ লাভ করিতে পারিবেন। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে কখন কোন প্রসঙ্গ হইলে তিনি অবজ্ঞার সহিত বলিতেন—"বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।" মধুসূদনেরও বিশেষ অপরাধ ছিল না। বাঙ্গালা ভাষার তখন যে অবস্থা ছিল, তাহাতে পাশ্চাত্য-ভাষায় সুশিক্ষিত কোনও ব্যক্তির পক্ষে তাহার অনুশীলন দ্বারা তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা ছিল না। যাঁহাদের চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা এক্ষণে সমৃদ্ধিমতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহই তখন লেখনী ধারণ করেন নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালা ভাষার পিতৃস্থানীয় বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত তখন বাঙ্গালা সাহিত্যে অপরিচিত ছিলেন। কাশীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষার যে দুই একজন কবির প্রতি মধুসূদনের অনুরাগ ছিল, তাঁহাদিগের কাব্য কলেজে পঠিত হইত না। রামরাম বসু-প্রণীত "প্রতাপাদিত্য-চরিত" ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-প্রণীত "পুরুষ-পরীক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থ তখন কলেজের

পাঠ্যপুস্তক ছিল। এই সকল পুস্তকের ভাষা যে কি উপাদেয়, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। সিনিয়ার-বৃত্তি-পরীক্ষার একখানি প্রশ্নপত্র হইতে কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। সে সময়কার ছাত্রেরা বাঙ্গালা ভাষা আলোচনার কিরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন, এই উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে :—

"শ্লাঘা অতি নিন্দনীয়া। শ্লাঘা দ্বারা সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য অহঙ্কারযুক্তের ন্যায় প্রকাশ পায়। তাহাতে সর্ব্বলোক তুচ্ছতা করে এবং কেহ তাহাকে আদর করে না। আর আপনার প্রশংসায় কি আপনি প্রশংসিত হয়? তাহা কখন হয় না। যেমন আপনার নয়ন দ্বারা স্বীয় নয়নের গুণ দোষ দেখিতে পায় না, তাহার ন্যায় জানিবা। আর আত্ম-প্রশংসা হেতু পরের গুণ-জ্ঞান করণে সমর্থ হয় না। সেই ব্যক্তির শাস্ত্রাদিজ্ঞান কি প্রকার হইতে পারে? অতএব শ্লাঘা বিদ্যার প্রধান প্রতিবন্ধিকা হয়; তাহাতে পরম জ্ঞান, পরম সুখের কথা কি কহিব, সামান্য সুখও হইতে পারে না। যেমন উষ্ণ অঙ্গার কাষ্ঠাদিকে দগ্ধ করণে সমর্থ হয় না, কেবল স্বয়ং উত্তপ্ত অন্যকেও উত্তপ্ত করেন, তাহার ন্যায় আত্মশ্লাঘাকারী ব্যক্তি আপনি উত্তাপযুক্ত হয়েন এবং অন্যকেও উত্তাপিত করেন, এতদ্রূপ অন্যান্য দোষ জানিবা।"

একদিকে বাঙ্গালা ভাষার এইরূপ অবস্থা, অপর দিকে দেশের রাজপ্রতিনিধি হইতে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকলেই ইংরাজী ভাষা অনুশীলনে উৎসাহদান করিতেছিলেন; সুতরাং এ অবস্থায় যে সে সময়কার ছাত্রমণ্ডলীর হৃদয়ে স্বদেশীয় ভাষার প্রতি উপেক্ষা জন্মিয়া ইংরাজী ভাষারই প্রতি অধিক অনুরাগ জন্মিবে, তাহা অসম্ভব নয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সে সময়কার কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলেই ছাত্রদিগকে রচনাভ্যাসে উৎসাহ দিতেন। শিক্ষা সমিতির বার্ষিক বিবরণীতে ছাত্রদিগের রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও প্রশ্নোত্তরগুলি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। পুরস্কারবিতরণ-সভায় গবর্ণর জেনারেল বা অন্য কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর এবং দেশীয় ও য়ুরোপীয় নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে তাহা পঠিত হইত;

ছাত্রেরা তজ্জন্য বৃত্তি এবং স্বর্ণ-রৌপ্য-নির্ম্মিত পদক ও পুরস্কার ইত্যাদি প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপ উৎসাহলাভের ফলেই সে সময়কার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে পরিণামে সুলেখক হইতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদন যখন সিনিয়ার বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময় খ্যাতনামা বাবু রামগোপাল ঘোষ স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য দুইটি পদক দিতে প্রতিশ্রুত হন। হিন্দুকলেজের মধ্যে যে দুইজন ছাত্র প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবেন, তাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। মধুসূদন এই প্রতিযোগিতায় প্রথম ও ভূদেববাবু দ্বিতীয় হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য গুণানুসারে স্বর্ণনির্ম্মিত ও রৌপ্যনির্ম্মিত পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে মধুসূদনের বাল্যাবধি কিরূপ সংস্কার ছিল এই রচনা হইতে তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। রচনাটি ইংরাজীতে লিখিত বলিয়া আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস

কাপ্তেন রিচার্ডসনের যত্নে মধুসূদনের লিখিত অনেক কবিতা সে সময়কার কোন কোন সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হইত এবং সেই জন্য ছাত্রাবস্থাতেই মধুসূদন অনেকের নিকট একজন ভাবী সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে পূর্ণ-বয়সে একজন কবি হইবেন তাঁহার সমকালবর্ত্তী ছাত্রদিগের সকলেরই সে সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। অনেকে তাঁহাকে তখনই "কবি" বলিয়া ডাকিতেন। মধুসূদনের নিজেরও দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, একদিন জগৎ তাঁহার কবিত্বের গৌরবে বিস্মিত হইবে। তিনি তাঁহার প্রিয় কবি বায়রণের জীবন-চরিত পাঠ করিয়া তাঁহার সুহৃদ্ গৌরদাসবাবুকে লিখিয়াছিলেন—আমি এক্ষণে টমাস মূরের লিখিত আমার প্রিয় কবি বায়রণের জীবন-চরিত পাঠ করিতেছি। বাস্তবিকই ইহা একখানি

অপূর্ব্ব গ্রন্থ। আমার বড সাধ হয় যে, আমি যদি কখনও একজন প্রসিদ্ধ কবি হইতে পারি, তুমি আমার জীবন-চরিত লিখিবে। যদি আমি ইংলণ্ড যাইতে পারি, তাহা হইলে যে আমি একজন প্রসিদ্ধ কবি হইব, তাহা নিঃসন্দেহ।*

অষ্টাদশবর্ষ-বয়স্ক একজন বালককে নিজের সম্বন্ধে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। বাল্যাবধি নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাসই প্রকৃত মহত্ত্বের চিহ্ন এবং মনুষ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান। আপাততঃ প্রগল্‌ভতাপূর্ণ বোধ হইলেও, ইহা অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচায়ক; বালক মধুসূদনের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে কি না বঙ্গ-সাহিত্য তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

ইংলণ্ড গমনের জন্য আকাঙ্ক্ষা

ইংলণ্ড গমন সম্বন্ধে পঠদ্দশা হইতে মধুসূদনের কিরূপ প্রগাঢ় বাসনা ছিল, তাঁহার পত্রের উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছেন। ইংলণ্ড কবি-প্রসবিনী, সেক্সপীয়ার, মিল্‌টন এবং তাঁহার প্রিয় কবি বায়রণের জননী। সুতরাং ভক্ত যেমন আরাধ্য-দেবের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র দর্শন নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণের অনুকূল বলিয়া মনে করেন, মধুসূদনও তেমনই ইংলণ্ড-গমন তাঁহার কবি-শক্তি পরিপুষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি তমলুক দর্শন করিয়া তাঁহার প্রিয়বন্ধু গৌরদাসবাবুকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তমলুক সমুদ্র হইতে অবিদূরে নদীমুখে অবস্থিত। তমলুক গমনের পথে ইংলণ্ডগামী অর্ণব-পোত-সমূহ দর্শন করিয়া মধুসূদনের বালক-হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইত।

---

* "I am reading Tom Moore's Life of my favourite Byron—a splendid book upon my word. Oh! How should I like to see you write my life, if I happen to be a great poet, which, I am almost sure, I shall be if I can go to England!"

তিনি গৌরদাসবাবুকে লিখিয়াছিলেন—"কাল যে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না, তজ্জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু গৌর, এই দুঃখের মধ্যে আমার একটি শান্তি আছে; অচিরকাল মধ্যে যে মহা-সমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া আমি ইংলণ্ডের গৌরবময় ভূমিতে উপনীত হইব, আমি সেই সমুদ্রের নিকটে আসিয়াছি। সমুদ্র এখান হইতে অধিক দূরে নয়। কত জাহাজই ইংলণ্ডে গমন করিতেছে দেখিয়াছি।"*

কেবল পত্রে নয়, কবিতাতেও মধুসূদন হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতেন। † তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ইংলণ্ডে গমন করিতে না

* "I am grieved to think that I will not meet ye to-morrow; but Gour, there is one consolation for me. I am come nearer that sea which will perhaps see me at a period—which I hope is not far off—ploughing its bosoms for England's glorious shore. The sea from this place is not very far; what a number of ships have I seen going to England!"

† সেইরূপ একটি কবিতা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

Oft like a sad bird I sigh
To leave this land, though mine own land it be;
Its green robed meads,—gay flowers and cloudless sky,
Though passing fair, have but few charms for me;
For I have dreamed of climes more bright and free,
Where virtue dwells and heaven-born liberty
Makes e'en the lowest happy:—where the eye
Doth sicken not to see man bend the knee
To sordid interest—climes where science thrives,
And genius doth receive her guerdon meet;
Where man in all his truest glory lives,
And nature's face is exquisitely sweet;
For those fair climes I heave the impatient sigh,
There let me live and there let me die.

KIDDERPORE, 18

পারিলে তাঁহার কবি-শক্তির বিকাশ হইবে না ; কিন্তু তাঁহার জীবনে ইহার বিপরীত ফলই লক্ষিত হইয়াছে। মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা এবং ব্রজাঙ্গনা প্রভৃতি তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি সমস্তই তাঁহার ইংলণ্ড গমনের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি যে দুই খানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই।

হিন্দুকলেজীয় শিক্ষার নিষ্কর্ষ

হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা মধুসূদনের প্রকৃতি-গঠনে কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, পাঠক এইবার বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা দেখাইয়াছি যে, তিনি যে সময় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা রচনাশক্তি পরি-বর্দ্ধনের অনুকূল ছিল, এবং তিনি যে শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত হইয়া-ছিলেন, তিনি একজন সুকবি ও কবিতার উৎসাহদাতা ছিলেন। সেই সঙ্গে আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, আবাল্য মধুসূদনের হৃদয়ে কাব্যানুরাগ ও অনুকরণেচ্ছা প্রবল ছিল। সুতরাং স্বাভাবিক শক্তির ও প্রবণতার সঙ্গে এইরূপ অনুকূল সামগ্রী সমূহের সম্মিলন হইলে যাহা হইবার সম্ভাবনা, মধুসূদনের ভাবী জীবনে তাহাই হইয়াছিল। নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশের সঙ্গে তাঁহার আশা ও উচ্চাভিলাষ বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং অষ্টাদশবর্ষ বয়সেই তিনি বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান ইংরাজী সাহিত্য-বিষয়ক পত্রে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইত না ; তিনি ইংলণ্ডের Bentley's Miscellany এবং Blackwood's Magazine প্রভৃতি পত্রে কবিতা প্রেরণ করিতেন। নিজের রচিত কবিতা শৈশব-সুহৃদ্দিগকে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার তৃপ্তিবোধ হইত না, তিনি ওয়ার্ডসৃওয়ার্থের ন্যায় কবি-কুলতিলককে উদ্দেশ করিয়া কবিতা উৎসর্গ করিতেন।*

* মধুসূদনের বিস্তৃত জীবন-চরিতে তাঁহার লিখিত এই সকল পত্র ও কবিতা প্রদত্ত হইয়াছে

কলেজে অধ্যয়নের সময় মধুস্থদনের চরিত্রে যে সমস্ত দোষ, গুণ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ তাহাদিগেরই পরিবর্দ্ধন করিয়াছিল ; নূতন কিছু উৎপাদন করিতে পারে নাই। এই সময়েই আমরা দেখিতে পাই যে, মধুস্থদন অমিতব্যয়ী, বিলাসী এবং ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই যে, তিনি অধ্যয়নশীল, কাব্যানুরাগী, প্রেম-পিপাসু, পরদুঃখ-কাতর এবং উদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ়ব্রত। এই সময়ে তিনি জীবনের যে লক্ষ্য নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, কোনরূপ ভাবী ঘটনাই তাহা তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসারিত করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়া লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা বিধাতার মনোনীত ছিল না। অকস্মাৎ তাঁহার জীবনে এমন একটি অচিন্তিত-পূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হইল যে, লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য, তাঁহাকে পূর্ব্বপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন পথে গমন করিতে হইল। ঘটনাটি কি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা উল্লিখিত হইবে।

---

# চতুর্থ অধ্যায়

## খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ ও বিশপ্স-কলেজে অধ্যয়ন

[ ১৮৪৩-৪৭ খৃষ্টাব্দ ]

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে মধুসূদনের জীবনের যে অচিন্তিত-পূর্ব্ব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণই সেই ঘটনা। কি জন্য যে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্যের পক্ষে অভ্রান্তরূপে তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। কেহ কেহ খৃষ্টীয় কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ও খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগের উপদেশ শ্রবণ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু মধুসূদনের খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ সম্বন্ধে সেরূপ কোন কারণ ছিল না। হিন্দুকলেজীয় শিক্ষা খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের পক্ষে অনুকূল ছিল না বরং প্রতিকূল ছিল বলা যাইতে পারে।

মধুসূদনের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের কারণ

যে দুইজন হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের নেতা, শিক্ষক এবং আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন, সেই ডেভিড্ হেয়ার ও রিচার্ডসনের মধ্যে কেহই খৃষ্টধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন না। হেয়ার হিন্দু স্কুলকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন এবং এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তখন ইংরাজী শিক্ষার প্রতি লোকের এখনকার ন্যায় অনুরাগ সঞ্চার হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষায় ধর্ম্মলোপ হইবার ভয়ে কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তখন সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে সঙ্কুচিত হইতেন। ইহার উপর কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে হিন্দুকলেজের বিশেষ অনিষ্ট হইবে এবং সেই সঙ্গে এদেশে ইংরাজী

শিক্ষা প্রচলনের পথ অবরুদ্ধ হইবে, এই ভাবিয়া মহাত্মা হেয়ার সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। ছাত্রেরা যাহাতে কিছুতেই খৃষ্ট-ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সংসর্গে না আসিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। রিচার্ডসন যদিও হেয়ার সাহেবের ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না, তথাপি খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার যে আন্তরিক অনাস্থা ছিল, তাহা তিনি ব্যক্ত করিতে ত্রুটি করিতেন না। এরূপ অবস্থায় হিন্দুকলেজের শিক্ষা যে মধুসূদনের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের কারণ নহে, তাহা একরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। তাঁহার সহিত যাঁহারা বাল্যাবধি ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা বলেন যে, "মধু যে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, আমরা তাহা কখনও কল্পনা করি নাই। অকস্মাৎ তাহার খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের সংবাদে আমরা সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলাম।" মধুসূদনের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণেরও বিশ্বাস এইরূপ। তাঁহারা বলেন, "ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অনুরোধে মধুসূদন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই; খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার য়ুরোপ গমনের সুবিধা হইবে, এবং তিনিও অপ্রীতিকর বিবাহের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবেন, এই ভাবিয়াই তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।" ইংলণ্ড-গমন সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ আগ্রহ ছিল, আমরা পূর্ব্বেই তাহার আলোচনা করিয়াছি। কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে তাঁহার পিতামাতা তাঁহাদিগের স্বদেশস্থ কোন সম্ভ্রান্ত জমীদারের কন্যার সহিত মধুসূদনের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। বিবাহ করিলে তাঁহার ইংলণ্ড-গমনে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে ভাবিয়া মধুসূদনের এ বিবাহে সম্মতি ছিল না। কন্যাটি মধুসূদনের পিতামাতার মনোনীতা হইলেও তাঁহার নিজের মনোনীতা ছিল না। তিনি তাঁহার কোন পিতৃব্যপুত্রকে এ সম্বন্ধে এইরূপ এক পত্র

খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে হেয়ার ও রিচার্ডসন

অপ্রীতিকর বিবাহের প্রস্তাব

লিখিয়াছিলেন ;—"আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না। আমি এমন কাজ করিব যে, সেজন্য বাবাকে চিরকাল দুঃখ করিতে হইবে।" অপরিণামদর্শী মধুস্থদন তখন জানিতেন না যে তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যের বিষময় ফল পিতার অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক ভোগ করিতে হইবে। তিনি পিতার নিকট আপনার অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। পুত্রের উপর পিতার চিরন্তন অধিকার আছে এবং মধুস্থদন বালক, নিজের হিতাহিত বুঝিবার তাঁহার শক্তি কি, এইরূপ সরল বিশ্বাসবশতঃ মধুস্থদনের পিতা পুত্রের অসম্মতি সত্ত্বেও তাঁহার বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিলেন।

একদিকে পিতামাতার সঙ্কল্পিত বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ বিরাগ ছিল; অপরদিকে তাঁহার পরিচিতা কোন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী বালিকার রূপগুণের তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে এই কুমারীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইতে পারে, যে কোন কারণেই হউক তাঁহার এইরূপ আশা জন্মিয়াছিল। তখন ইংলণ্ড-গমন এখনকার অপেক্ষা শতগুণ অধিক দোষাবহ ও সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য ছিল। ইংলণ্ড-গমন সম্বন্ধে মধুস্থদন স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে, তজ্জন্য তাঁহাকে একদিন না একদিন সমাজচ্যুত হইতেই হইবে। সুতরাং এখন সমাজ ত্যাগ করিলে যদি তিনি মনোনীত পত্নীলাভ করিতে এবং সেই সঙ্গে নিজের অপ্রীতিকর বিবাহের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন, তবে তাহাই করা কর্ত্তব্য, তাঁহার এইরূপ ধারণা হইল। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া একদিন অকস্মাৎ তিনি পিতৃগৃহ হইতে অদৃশ্য হইলেন। মধুস্থদন যে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহার আত্মীয়গণের মধ্যে কাহারও মনে সেরূপ সন্দেহ কখনও উদিত হয় নাই; সুতরাং তাঁহার এরূপভাবে গৃহত্যাগের সংবাদে সকলেই চমকিত হইলেন।

পিতৃগৃহ-ত্যাগ

খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণেচ্ছু বালকেরা পাছে আত্মীয়গণের অনুরোধে ধর্ম্মত্যাগে অস্বীকৃত হয়, সেই ভয়ে খৃষ্টান যাজকগণ তাহাদিগকে আপনাদিগের গৃহে স্থান দান করিয়া আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। মধুসূদনের সম্বন্ধে তাঁহারা আরও কঠোরতর উপায় অবলম্বন করিলেন। মধুসূদনের পিতা একজন সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এবং কলিকাতার অনেক প্রতিপত্তিশালী পরিবারের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। কলিকাতার পুলিস তখন এখনকার ন্যায় সুগঠিত ও ক্ষমতাশালী ছিল না। পাছে মধুসূদনের আত্মীয়গণ তাঁহাকে তাঁহাদিগের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া লন, সেই ভয়ে খৃষ্টান যাজকগণ মধুসূদনকে অন্যত্র না রাখিয়া একেবারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মধুসূদনের পিতা লাঠিওয়াল ও সড়্‌কি-ওয়ালাদিগের সাহায্যে পুত্রকে উদ্ধার করিবেন আশা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কয়েকদিন এই ভাবে কেল্লায় অবস্থিতির পরে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি মধুসূদন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

**খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ**

সেইদিন হইতে তাঁহার মধুসূদন নামের সঙ্গে মাইকেল নাম সংযুক্ত হইল। এই উপলক্ষে মধুসূদন যে ধর্ম্মসঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

I

Long sunk in superstition's night,
By Sin and Satan driven,—
I saw not,—cared not for the light
That leads the blind to Heaven.

II

I sat in darkness,—Reason's eye
Was shut,—was closed in me ;—
I hasten'd to Eternity
O'er Error's dreadful sea !

III

But now, at length, thy grace, O Lord !
Bids all around me shine ;
I drink thy sweet,—thy precious—word,
I kneel before thy shrine !—

IV

I've broke Affection's tenderest ties
For my blest Savior's sake ;—
All, all I love beneath the skies,
Lord ! I for Thee forsake !

পিতামাতার ব্যবহার

খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মধুস্থদন যদিও পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তথাপি পিতামাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। তাঁহার জননী তাঁহাকে আত্মহারা হইয়া ভালবাসিতেন ; সে ভালবাসার কিছুতেই পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। মধুস্থদনের গৃহ হইতে অন্তর্দ্ধান অবধি তিনি আহার, নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন ; এবং যে দিন তিনি শুনিলেন যে, মধুস্থদন সত্যই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন অবধি তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছিলেন। যিনি, মধুস্থদন কতক্ষণে কলেজ হইতে প্রত্যাগমন করিবেন, এই প্রত্যাশায় পথের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, পুত্রের এরূপ ব্যবহারে তাঁহার প্রাণে যে কি নিদারুণ বেদনা লাগিয়াছিল, তাহা বলিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রকে সময়ে সময়ে গোপনে গৃহে আহ্বান করিতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু সমাজের ভয়ে তাঁহাকে গৃহে রাখিতে সাহসী হইতেন না। হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও মধুস্থদন যাহাতে সুশিক্ষিত ও যশস্বী হইয়া পরিণামে স্থখী হইতে পারেন, মধুস্থদনের পিতামাতা তজ্জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশীয় খৃষ্টান ও ইংরাজ-বালকদিগের শিক্ষার জন্য তৎকালে শিবপুরে বিশপ্স-কলেজ

নামক একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মধুসূদন সেখানে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহারা আনন্দের সহিত তাঁহার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। হিন্দুকলেজ

বিশপ্স-কলেজে প্রবেশ, ভাষা-শিক্ষায় অনুরাগ

যেমন মধুসূদনের রচনা-শিক্ষার, বিশপ্স-কলেজ তেমনই তাঁহার ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্র। মধুসূদন সাধারণের নিকট কবি বলিয়াই প্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনি যে ভারতবাসীদিগের মধ্যে একজন কিরূপ বহুভাষাবিদ্ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। ইংরাজী ভাষা তাঁহার মাতৃভাষারই ন্যায় ছিল। লাটিন, গ্রীক্, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ এবং ইতালিয়ান, এই কয়টি ভাষায় তিনি অক্লেশে কথোপকথন করিতে এবং পত্রাদি লিখিতে পারিতেন। ইহার মধ্যে ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় তাঁহার এতদূর অধিকার ছিল যে, তিনি তাহাতে কবিতা পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন। এই ছয়টি য়ুরোপীয় ভাষা ভিন্ন সংস্কৃত, পারসীক, হিব্রু, তেলেগু, তামিল এবং হিন্দুস্থানী, এই ছয়টি ভাষাতেও তাঁহার অল্লাধিক অভিজ্ঞতা ছিল ; সুতরাং মাতৃভাষা বাঙ্গালা ছাড়া বারটি বিভিন্ন ভাষার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ বলিয়াছিলেন, মধুসূদনের সমকালবর্ত্তীদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় বহুভাষাবিদ্ ব্যক্তি আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ।* বাস্তবিকও ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় অসাধারণ শক্তি অতি অল্প লোকের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয়। বিশপ্স কলেজ হইতেই তাঁহার এই ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবণতা পরিস্ফুরিত হইতে থাকে।

* As a linguist and a scholar, he had scarcely any equal among his contemporaries, and there is hardly any individual, even in these days, among his countrymen who could excel him in his knowledge of the European languages, and in the literature, both ancient and modern, of European countries.

হিন্দুকালেজে অধ্যয়নের সময়ে তিনি ইংরাজী ও পারসীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিশপ্স-কলেজে প্রবেশ করিয়া তিনি গ্রীক, লাটিন এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বিশপ্স-কলেজের অনেক অধ্যাপক বহুভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত হইতেই মধুসূদনের হৃদয়ে ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে অনুরাগ উদ্ভূত হইয়াছিল।

উচ্ছৃঙ্খলতা ও তজ্জনিত অশান্তি

মধুসূদন বিশপ্স-কলেজে চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। ভাষা-শিক্ষা ও কবিতানুশীলন সম্বন্ধে তিনি এই কয় বৎসরে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে তিনি এখানে সদাচার ও সংযম সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। বিশপ্স-কলেজে তিনি নিজেই নিজের অভিভাবক ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক কেহ নিকটে থাকিতেন না। তাঁহার পিতা, মাতা তাঁহাকে মাসিক প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেন; কিন্তু মধুসূদন যে সে অর্থ কিরূপে ব্যয় করিতেছেন, তাঁহারা তাহার সংবাদ রাখিতেন না। কলেজ-গৃহের অভ্যন্তরে যথেষ্ট শাসন ছিল; কিন্তু কলেজের বাহিরে অবকাশ দিনে ছাত্রেরা কে কিরূপ ব্যবহার করে, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহার বড় সংবাদ পাইতেন না। অসংযতচিত্ত ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তির জগতে শান্তির আশা কোথায়? মধুসূদনের হৃদয়ের শান্তি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তাঁহার স্নেহপ্রবণ-হৃদয়া জননীর অনুরোধে তিনি মধ্যে মধ্যে পিতৃগৃহে আগমন করিতেন; কিন্তু সেখানেও শান্তির প্রত্যাশা ছিল না। ধর্ম্মমত ও সামাজিক আচার ব্যবহার লইয়া সময়ে সময়ে পিতার সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হইত। পিতা তিরস্কার করিতেন; শাসনে ও সংযমে অনভ্যস্ত মধুসূদনের তাহা সহ্য হইত না; তিনি উদ্ধতের ন্যায় প্রত্যুত্তর দিতেন। তাঁহার পিতা শেষে বিরক্ত হইয়া তাঁহার মাসিক সাহায্য

বন্ধ করিয়া দিলেন। মধুস্দনের জননীর স্নেহের হ্রাসবৃদ্ধি ছিল না। স্বামীর ও পুত্রের মধ্যে এরূপ মনোবাদ দেখিয়া তিনি দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেন, কিন্তু প্রতিবিধান করার তাঁহার শক্তি ছিল না। মধুস্দনের হৃদয়ের অশান্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যে সকল আশায় তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই তিনি প্রাপ্ত হইলেন না। যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন এবং তিনিও যাহাদিগকে ভালবাসিতেন, ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার সেই বাল্যসুহৃদ্‌গণও তাঁহার নিকট হইতে ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছিলেন। মধুস্দনের মনে সংস্কার জন্মিল যে, জগতে তাঁহাকে স্নেহ করিতে কেহ নাই। স্বদেশ তাঁহার নিকট প্রবাস এবং পিতৃগৃহ তাঁহার নিকট অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হইল। কলিকাতা ছাড়িয়া অন্য যে কোন স্থানেই হউক, যাইতে পারিলে তাঁহার হৃদয়ের শান্তি ফিরিয়া আসিবে, তাঁহার এইরূপ ধারণা জন্মিল। বিশপ্স-কলেজে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দুই এক জনের সঙ্গে মধুস্দনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাঁহাদিগের নিকট মান্দ্রাজের কথা শুনিয়া তিনি মনে করিলেন যে, সেখানে যাইলে তিনি সুখী হইতে পারিবেন।

মান্দ্রাজ-গমন

গোপনে গোপনে সমস্ত পরামর্শ স্থির হইল; অবশেষে একদিন পিতা, মাতা, আত্মীয়, বন্ধু কাহাকেও কিছু না বলিয়া মধুস্দন বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন।

# পঞ্চম অধ্যায়

## মান্দ্রাজ-প্রবাস

[ ১৮৪৮-৫৬ খৃষ্টাব্দ ]

মান্দ্রাজ-প্রবাসকালীন অবস্থা

কি অবস্থায় মধুসূদন মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তিনি যখন মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলেন, তখন তাহার অবস্থা এখনকার ন্যায় ছিল না। এখন রেলওয়ে ও বাষ্পীয়-পোতের প্রচলনে মান্দ্রাজের দূরতা অপনীত হইয়াছে; কিন্তু তখন মান্দ্রাজ-গমন এখনকার দিনের ইংলণ্ড-গমনের ন্যায় কষ্টসাধ্য ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এখন দুই চারিজন বাঙ্গালী বিষয়-কার্য্যোপলক্ষে মান্দ্রাজে বাস করিতেছেন, কিন্তু তখন মধুসূদনের স্বদেশীয় একজন লোকও বোধ হয় সেখানে ছিলেন না। সেখানকার ভাষা এবং আচার ব্যবহার কোন বিষয়েই মধুসূদনের অভিজ্ঞতা ছিল না। জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করাতে তিনি হিন্দুসমাজের ঘৃণার আস্পদ হইয়াছিলেন। ইহার উপর তিনি আবার রিক্তহস্ত। পাঠ্যপুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া যে সামান্য অর্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, পাথেয় প্রভৃতিতে অল্পদিনের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইয়াছিল। একেই ত এই নিঃসম্বল অবস্থা, তাহার উপর মান্দ্রাজে পঁহুছিবার পরই তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং কিয়ৎকাল তাঁহাকে দারুণ দুরবস্থায় জীবনযাপন করিতে হইয়াছিল। পিতার সহিত মনোমালিন্য আরব্ধ

হইবার সঙ্গেই তাঁহার অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যতদিন তিনি কলিকাতায় ছিলেন, তাঁহার স্নেহময়ী জননী স্বামীর অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অর্থ-সাহায্য করিতেন, সুতরাং দারিদ্র্য-জনিত ক্লেশ যে কি মর্ম্মভেদী, মধুসূদন এতদিন তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করেন নাই। কিন্তু এই সময় হইতে তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহার তিক্ত আস্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে মান্দ্রাজের দেশীয় খৃষ্টান ও ফিরিঙ্গী-সম্প্রদায়ের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইল। তাঁহারা মধুসূদনকে পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহাদিগের অনুগ্রহে তিনি পিতৃমাতৃহীন ফিরিঙ্গী বালকদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা-কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অর্থাভাব ক্লেশ কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইল; এবং তাঁহার নিজের ভাষায় বলিতে হইলে, "প্রবল ঝটিকা অতিক্রম করিয়া কূল প্রাপ্ত হইলে নাবিক যেমন শান্তিলাভ করে," তিনিও তেমনই শান্তিলাভ করিলেন।

সাহিত্য-সেবা

পৃথিবীর অনেক আপাত-প্রতীয়মান অমঙ্গলের ন্যায় মধুসূদনের মান্দ্রাজ-প্রবাস-কালীন দুরবস্থাও এক বিষয়ে তাঁহার ভবিষ্যত কল্যাণের কারণ হইল। প্রকৃতি তাঁহার অভ্যন্তরে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, নিরাশা ও দরিদ্রতার সংঘর্ষে এইবার তাহা উদ্গত হইবার সুযোগ লাভ করিল। উপায়ান্তরের অভাবে তিনি অর্থাগমের জন্য সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। এতদিন তিনি অনুশীলনার্থ এবং অবকাশ-কালের বিনোদনের জন্য সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু এখন তাঁহাকে প্রাণধারণার্থ সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। তিনি মান্দ্রাজের প্রধান সংবাদপত্রসমূহে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তখন এদেশীয়দিগের মধ্যে অতি অল্প লোকই তাঁহার ন্যায় সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন, সুতরাং

স্বল্পকালেরই মধ্যে তাঁহার সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল এবং মান্দ্রাজের কৃতবিদ্যসমাজে তিনি একজন সুলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন।

যদিও হিন্দুকলেজে পাঠ করিবার সময়েই মধুসূদনের লিখিত অনেক কবিতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি এতদিন তিনি গ্রন্থকাররূপে সাধারণের সমক্ষে আবির্ভূত হন নাই। মান্দ্রাজে তিনি যে সমস্ত পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহাদিগের মধ্যে Madras Circular & General Chronicle, Madras Spectator এবং Athenaeum এই তিনখানির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত পত্রিকাখানির জন্য তিনি কবিতায় একটি উপাখ্যান লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সাধারণের পরিতোষে ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তিনি ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। এই উপাখ্যানের নাম ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ।

"ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী" রচনা

ইতিহাস-প্রথিত পৃথ্বীরাজের চরিত্র অবলম্বন করিয়া ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী রচিত হইয়াছিল। রাজকুমারী সংযুক্তাকে পৃথ্বীরাজের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য রাজা জয়চন্দ্র তাঁহাকে দ্বীপমধ্যস্থিত একটি গিরিদুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ ভাটবেশে সেখান হইতে রাজকুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া যান এবং তাহার পর মুসলমানগণ পৃথ্বীরাজের রাজধানী অবরোধ করিলে পৃথ্বীরাজ তাঁহাদিগের হস্তে পরাজিত হইয়া অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন। ইহাই সংক্ষেপে ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডীর বর্ণনীয় বিষয়। ঘটনা-বৈচিত্র্য অথবা ভাবের লালিত্য অনুসারে বিচার করিলে ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডীতে উল্লেখ-যোগ্য বিশেষ কিছুই নাই; কিন্তু একটি কারণে ইহা আলোচনার

"ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী"র বর্ণনীয় বিষয়

উপযুক্ত। তরুণ-বয়সে ইংরাজী ভাষার উপর মধুসূদনের কিরূপ অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল এবং ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা কিরূপ ছিল, ইহা হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। ইহার দুই একটি স্থল পাঠ করিলে মনে হয়, যেন বায়রণ, মূর বা স্কটের কোন গ্রন্থ পাঠ করিতেছি। মেঘনাদবধের যে তেজঃপ্রদীপ্ত ভাষা বঙ্গীয় কবিতায় এক অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডীতে তাহার প্রথম স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মধুসূদনের ভাষা যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী কবিগণের ভাষা হইতে বিভিন্ন, তাহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি তাহা কোমল-মধুর সংস্কৃত ভাষা হইতে শিক্ষা করেন নাই; সমধিক ওজোগুণান্বিত পাশ্চাত্য ভাষা সমূহ হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী পাঠ করিলে মধুসূদনের রচনাপ্রণালীরও আদর্শ বুঝিতে পারা যায়। যে অলঙ্কার-বিন্যাস-প্রিয়তা মধুসূদনের রচনার একটি বিশেষ লক্ষণ, ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডীর সর্ব্বত্রই তাহার আতিশয্য লক্ষিত হইবে। ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডীতে প্রযুক্ত অনেক অলঙ্কার ও ভাব, পরে তিনি তাঁহার অন্যান্য কাব্যে পরিবর্ত্তিত আকারে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

"ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী"র ভাষা ও ভাব

ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডীর সঙ্গে ভিসন্স্‌ অব্‌-দি-পাষ্ট (Visions of the past) নামক আর একটি অসম্পূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ভিসন্স্‌-অব-দি-পাষ্টের অবলম্বনীয় বিষয় কি, ইহার বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ আকার হইতে অনুমান করিতে পারা যায় না।

স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া মধুসূদন একরূপ নির্ব্বাসিতের ন্যায় মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিবাহ করিয়া এই স্থানে তিনি প্রথমে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি

বিবাহ ও পত্নী-ত্যাগ

রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস্ নাম্নী স্কচ্-বংশোৎপন্না একটি কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক সুখ ও ধর্ম্মোপার্জ্জনই বিবাহের উদ্দেশ্য; কিন্তু আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া সুখী হইতে হইলে, যে সহিষ্ণুতার, স্বার্থত্যাগের এবং আত্মসংযমের প্রয়োজন, মধুসূদনের চরিত্রে তাহা ছিল না। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে পত্নীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন কোন শিক্ষকের দুহিতা কুমারী হেন্‌রিয়েটাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া তিনি জীবনযাপন করিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহার পত্নী পুত্রাদির কথা দেখিলে পাঠক এই শেষোক্তা মহিলার ও তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র-কন্যাদির কথা বলিয়া বুঝিয়া লইবেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, "ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী" রচনা করিয়া মধুসূদন মান্দ্রাজের কৃতবিদ্যসমাজে প্রতিপত্তি-লাভ করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজে "ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী"র সমাদর

মান্দ্রাজের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্রে তাঁহার কাব্যের সুখ্যাতি প্রকাশিত হইয়াছিল। আথিনীয়ম্ পত্রিকার কোন ইংরাজীপত্র-প্রেরক "ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী"র সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—"ইহাতে এমন অনেক স্থান আছে, যাহা বায়রণ অথবা স্কট্ নিজের রচনা বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না" (what I believe neither Scott nor Byron would have been ashamed to own)। বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ-রচনা করিয়া পঞ্চবিংশবর্ষবয়স্ক একজন যুবকের পক্ষে এরূপ প্রশংসালাভ অবশ্যই গৌরবের বিষয়; কিন্তু প্রতিভাবান্ পুরুষগণ যেমন সাধারণের অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হন, তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষাও তেমনই উচ্চতর হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ প্রশংসা অন্যের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও মধুসূদন তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। না হইবার একটি বিশেষ

কারণ ছিল। শূন্যগর্ভ প্রশংসা লইয়া পরিতৃপ্ত থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁহার গৃহে অন্নাভাব ঘটিতেছিল, তিনি প্রশংসা লইয়া কি করিবেন? মান্দ্রাজের কৃতবিদ্য-সমাজের প্রশংসায় তিনি প্রথম প্রথম বড়ই উল্লসিত ও আশ্বস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রথম উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইবার পরেই, নিরাশা ও অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ বায়রণের, কেহ স্কটের কাব্যের সঙ্গে তাঁহার কাব্যের তুলনা করিতেছিলেন; আর তিনি, মুদ্রাযন্ত্রের ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বেড়াইতেছিলেন; এরূপ অবস্থা গ্রন্থকারের পক্ষে বড় উৎসাহোদ্দীপক নয়। মধুসূদনের আশা ছিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন মান্দ্রাজ তাঁহাকে অর্থদানে উৎসাহিত না করুক, জ্ঞানোজ্জ্বল কলিকাতা নিশ্চয়ই তাঁহার কাব্যের সমুচিত সমাদর করিবে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে মধুসূদনের সে আশাও উন্মূলিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজে অর্থাগমের সুবিধা না হউক, অন্ততঃ সুলেখক বলিয়াও তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু কলিকাতায় তাঁহার ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে সে সময়কার কলিকাতা-সমাজের অগ্রণীস্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা "ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী"র সম্বন্ধে একরূপ উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে সকল সংবাদপত্র-সম্পাদকের নিকট "ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী" সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহারা কেহই তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রশংসাজনক কথা বলিয়া কবিকে উৎসাহিত করেন নাই। উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভের দুরাশা যেন তিনি হৃদয়ে পোষণ না করেন, কেহ কেহ এই ভাবেই তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। নিজের সাংসারিক অভাবের ও মানসিক অশান্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া মধুসূদন "ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী"র ভূমিকায়

কবির উল্লাস ও অবসাদ

কলিকাতায় "ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী"র অনাদর

লিখিয়াছিলেন যে, "যে অবস্থায় পড়িয়া তিনি গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কবিশক্তি বিকাশের উপযোগিনী নয়।" কোন সম্পাদক এই উপলক্ষ করিয়া তাঁহার দরিদ্রাবস্থারও প্রতি বক্রোক্তি করিতে ত্রুটী করেন নাই। মধুসূদনের সাহায্যার্থ তাঁহার কলিকাতাস্থ বন্ধুগণ "ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী" বিক্রয়ের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা পঞ্চাশ, ষাট জনের অধিক গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। দুই একজন কৃতবিদ্য অথবা পদস্থ ব্যক্তি গ্রন্থকারকে মৌখিক উৎসাহ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন যে, তাহা তাঁহার গ্রন্থের গুণের জন্য নয়, তাঁহার নিজের প্রতি অনুকম্পাপ্রদর্শনার্থ। কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে মধুসূদন কাহারও অনুগ্রহের বা অনুকম্পার ভিক্ষুক ছিলেন না। যাঁহারা কাব্য-জগতে সকলের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইবেন এবং তাঁহার কবিত্বের গৌরবে জগৎকে বিস্মিত করিবেন, "astound the world with his fame" বাল্যাবধি ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। সুতরাং এরূপ অনুকম্পাপ্রদর্শনে উৎসাহিত না হইয়া তিনি বরং ব্যথিত হইয়াছিলেন। নিজের শক্তি ও সামর্থ্য তিনি বুঝিতেন; উপেক্ষাকারীর উপেক্ষা এবং অনুকম্পাশীলের অনুকম্পা সমভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি স্বতন্ত্র পথ দিয়া লক্ষ্যস্থানে উপনীত হইবার সঙ্কল্প করিলেন।

"ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী"র অনাদরে মধুসূদনের মনের ভাব

মধুসূদন অনেক বিষয়ে চপল ও অস্থির-চিত্ত ছিলেন; কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার কখনও মতিভ্রম হয় নাই। সাহিত্যের সেবা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিব, এ সম্বন্ধে তাঁহার লক্ষ্য ধ্রুবতারার ন্যায় চিরদিন নিশ্চল ছিল। নিন্দা, উপেক্ষা, দরিদ্রতা, পারিবারিক অশান্তি,কিছুতেই তিনি সে লক্ষ্য হইতে বিচলিত হন নাই। "ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী" প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার জীবনের প্রথম উদ্যম। প্রথম উদ্যমে

অকৃতকার্য্য হইলে অনেকেই নিরাশ্বাস ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন। কিন্তু মধুসূদন ভগ্নোদ্যম হইবার পাত্র ছিলেন না। "ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী" অনাদৃত হইলেও তাঁহার লক্ষ্য পূর্ব্বের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট রহিল; তবে এক বিষয়ে একটি অতি গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিল। লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য এতদিন তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন তিনি তাহার দুর্গমতা অনুভব করিতে পারিলেন। "ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণা ছিল যে, ইংরাজী সাহিত্যেরই অনুশীলন দ্বারা তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবেন; কিন্তু এখন হইতে তাঁহার সে ভ্রম দূরীভূত হইল। সুস্পষ্টরূপে তখনও বুঝিতে না পারুন, এই সময় হইতে তাঁহার উপলব্ধি জন্মিল যে, সেক্সপীয়াবের এবং মিল্টনের ভাষায় চিরস্থায়ী কীর্ত্তিলাভ বিদেশীয়ের পক্ষে সুসাধ্য নয়। মান্দ্রাজে তাঁহাকে কেহ এরূপ কথা বলে নাই; কিন্তু কলিকাতায় যাঁহাদিগের নিকট তিনি বিশেষ সমাদরের আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন তাঁহাকে তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ইঁহাদিগের মধ্যে একজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি আমাদিগের দেশের স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্ত্তক, সুপরিচিতনামা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। মহাত্মা বেথুন তখন আমাদিগের দেশে ব্যবস্থা-সচিব ও শিক্ষাসমাজের (Education Council) সভাপতি ছিলেন। সুতরাং তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির মতামত যে কতদূর মূল্যবান্‌ তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বেথুন যে ভাবে "ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী"র সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই তাঁহার ন্যায় মহাত্মার উপযুক্ত হইয়াছিল। তিনি গ্রন্থকারকে ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহার প্রথম উদ্যমে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই; সস্নেহ উপদেশবাক্যে তাঁহার অবলম্বিত পথের কুটিলতা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য

বেথুনের উপদেশ ও পত্র

অপেক্ষাকৃত সরল, সুপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকে মহাত্মা বেথুনকে কেবল বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তক বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি যে আমাদিগের জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় অতি অল্পলোকই অবগত আছেন। বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য আমরা যে সকল বৈদেশিক পুরুষের নিকট ঋণী আছি, মহাত্মা বেথুন তাঁহাদিগের অন্যতম। তাৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করিবার জন্য তিনি যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, বৈদেশিকদিগের মধ্যে আর কেহই বোধ হয় সেরূপ করেন নাই। সংবাদপত্রের স্তম্ভে, সভাস্থলে বক্তৃতায়, কথোপকথনকালে এবং পত্রে, সর্ব্বত্রই তিনি বাঙ্গালা-ভাষা সম্বন্ধে নিজের অনুরাগ ব্যক্ত করিতেন। শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষরূপে যখন তিনি কোন বিদ্যালয়ের পুরস্কার-প্রদান-সভায় উপস্থিত থাকিতেন, তখন তিনি সেখানকার ছাত্রদিগের হৃদয়ে যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হয়, তজ্জন্য উপদেশ দিতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের হৃদয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হইতেছে কি না, ইহাই অনেক স্থলে তাঁহার প্রথম জিজ্ঞাস্য ছিল। এরূপ অবস্থায় মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভাবান্ নবীন লেখককে যে তিনি বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে উপদেশ দিবেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মধুসূদন বেথুনকে তাঁহার "ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী" উপহার প্রেরণ করিলে বেথুন প্রত্যুত্তরে মধুসূদনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

মহাত্মা বেথুনের ন্যায় মধুসূদনের বন্ধুগণও তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে আহ্বান করিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয়-সুহৃদ্ গৌরদাসবাবু

যদিও নিজে বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন না, তথাপি মাতৃভাষার অনুশীলন ভিন্ন যে কোন গ্রন্থকারের পক্ষে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভের সম্ভাবনা নাই তাহা বুঝিতেন। সেই জন্য তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য রচনার জন্য মধুসূদনকে সর্ব্বদা অনুরোধ করিতেন। গৌরদাসবাবুর অনুরোধ, মহাত্মা বেথুনের সস্নেহ উপদেশ এবং কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের ঔদাসীন্য, মধুসূদনের পক্ষে পরিণামে মঙ্গলজনক হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে বিদেশীয় ভাষায় যতই অধিকার থাকুক, তাহাতে কাব্য-রচনা করিয়া চিরস্থায়ী গৌরব-লাভ করা কাহারও পক্ষে সহজ নয়। শুভক্ষণেই মধুসূদনের মনে এ কথা উদিত হইয়াছিল। যদি তিনি স্বদেশীয় সাহিত্যের সেবা না করিয়া কেবলই ইংরাজী সাহিত্যের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী লেখক ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন ; কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে কখনই স্থায়ী গৌরবলাভে সক্ষম হইতেন না।

শুভক্ষণে মধুসূদন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার দৃষ্টি তাঁহার শৈশবের অনাদৃত মাতৃভাষার উপর পতিত হইল এবং মাতৃভাষার অনুশীলন করিয়া যাহাতে তিনি চিরস্থায়ী গৌরব লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার বাসনা জন্মিল। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নের সময়ে তিনি বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে কিরূপ প্ররোচনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মাতৃভাষা বলিয়া তাহাতে স্বভাবতঃ তাঁহার যতটুকু অধিকার ছিল, মান্দ্রাজে আলোচনার অভাবে তাহাও ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। তথাপি তাঁহার সংস্কার জন্মিল যে, বাঙ্গালা ভাষাই তাঁহার কবিশক্তি-বিকাশের প্রকৃত ক্ষেত্র এবং তাহাতেই তিনি অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবেন। মাতৃ-ভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার উদ্দেশে এই সময় হইতে তিনি বিদ্যালয়ের

বালকের ন্যায় আগ্রহে ও পরিশ্রমে নানা ভাষা ও নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজের এই সময়কার অধ্যয়ন-প্রণালী সম্বন্ধে মধুসূদন গৌরদাসবাবুকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিলাসিতার ও ভোগাসক্তির মধ্যে মধুসূদনের বিদ্যোপার্জ্জন-স্পৃহা কিরূপ প্রবল ছিল, পাঠক ইহা হইতে তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। মধুসূদন আলস্যে সময়ক্ষেপ করিতেছেন, সন্দেহ করিয়া গৌরদাসবাবু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"এরূপ বৃথা সময়ক্ষেপ করা তোমার কর্ত্তব্য নয়; তুমি যদি তোমার শক্তি ও সামর্থ্য মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত করিতে, তাহা হইলে তাহা কতই ফলপ্রদ হইত।" মধুসূদন প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন—"আমার জীবন এখন বিদ্যালয়ের বালকের অপেক্ষা অধিক কার্য্যে ব্যস্ত। আমার কার্য্য-প্রণালী এইরূপ—৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত হিব্রু; ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত স্কুলে অধ্যাপনা; ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত গ্রীক্; ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত তেলেগু ও সংস্কৃত; ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত লাটিন এবং ৭টার পর হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ইংরাজী। ইহার পর কি তুমি বলিবে যে, আমি আমার মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি না?"* বিধাতা মধুসূদনকে স্বাস্থ্য ও প্রতিভা উভয়ই মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন, বিদ্যোপার্জ্জন সম্বন্ধে তিনি তাহার অপব্যবহার করেন নাই। তিনি বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু বঙ্গীয়

মধুসূদনের অধ্যয়নশীলতা

*"My life is more busy than that of a school-boy. Here is my routine :—6-8 Hebrew; 8-12 school; 12-2 Greek; 2-5 Telegu and Sanskrit; 5-7 Latin; 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers?" মধুসূদনের মান্দ্রাজ-প্রবাসকালীন লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত। বিস্তৃত জীবন-চরিত দেখ।

কবিগণের মধ্যে তিনি যে বিদ্যাবত্তায় সকলের অগ্রগণ্য, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

মধুসূদন মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য এইরূপে প্রস্তুত হইতে-ছিলেন বটে, কিন্তু মান্দ্রাজে তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। গ্রন্থ-রচনা দ্বারা তথায় প্রতিষ্ঠালাভের সুবিধা দূরে থাকুক, বৎসরান্তে কাহারও সহিত মাতৃভাষায় একটি বাক্য-বিনিময়েরও সুযোগ ছিল না। আটবৎসরব্যাপী প্রবাস বড় সামান্য সময় নয়; এই দীর্ঘ প্রবাসের ফলে বাঙ্গালা ভাষায় মধুসূদনের যৎসামান্য যে জ্ঞান ছিল, তাহাও ক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষার সহিত পাছে তাঁহার সম্বন্ধ লোপ হয়, সেই আশঙ্কায় তিনি কলিকাতা হইতে তাঁহার বাল্যের প্রিয় গ্রন্থ কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ আনাইয়া পাঠ করিতেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি যে আবার মাতৃভাষার অনুশীলন করিতে পারিবেন, ইহা তাঁহার নিকট দুরাশা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে কতকগুলি কারণে মধুসূদনের মান্দ্রাজ ত্যাগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। তিনি বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন; তাঁহার ভাবী জীবনের পথও সেই সঙ্গে পরিষ্কৃত হইল।

সাংসারিক অবস্থা
মান্দ্রাজ ত্যাগ

মধুসূদনের মান্দ্রাজ গমনের তিন বৎসর পরে, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। মৃত্যুর সময় মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার মাতার সাক্ষাৎ হয় নাই। মাতার মৃত্যুর চারি বৎসর পরে মধুসূদনের পিতাও পরলোক-গমন করেন। মধুসূদন সে সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহার কোন সংবাদ রাখিতেন না, তিনিও তাঁহাদিগের সংবাদ লইতেন না। মধুসূদন পরলোকগমন করিয়াছেন, এই বিশ্বাসে তাঁহা-দিগের মধ্যে কেহ কেহ মধুসূদনের পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি অধিকার

করিয়া বসিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের ফলে মধুসূদন পূর্ব্ব হইতেই আত্মীয়, বন্ধুগণের স্নেহ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন ; তাহার উপর আট বৎসরব্যাপী প্রবাসের ফলে এমনই ঘটিয়াছিল যে, তাঁহার পিতৃগৃহে তাঁহার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবার লোক কেহ ছিলেন না। স্বদেশে, বিদেশে সকলেই তাঁহার কথা ভুলিয়া আসিতেছিলেন ; কেবল একজনের নিকট তাঁহার স্মৃতি সমভাবেই জাগরূক ছিল। তাঁহার প্রিয়-সুহৃদ্ গৌরদাসবাবু তাঁহার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি পূর্ব্বেরই ন্যায় সস্নেহে মধুসূদনকে পত্র লিখিতেন, এবং তাঁহার সাংসারিক অবস্থার অনুসন্ধান লইতেন। মধুসূদনের পিতার মৃত্যুর পর তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি অন্যে আসিয়া অধিকার করিতেছে, অথচ মধুসূদন বিদেশে অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছেন। তিনি মধুসূদনকে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। এদিকে মধুসূদনেরও সাংসারিক অবস্থা সুবিধাজনক ছিল না। কল্পনায় তিনি যে সুখের বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল আকাশকুসুমে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক সুখ কিছুই তাঁহার ভাগ্যে স্থায়ী হয় নাই। তিনি মান্দ্রাজের একমাত্র দৈনিক পত্রিকা "স্পেক্টেটরের" ( Spectator ) সহকারী সম্পাদক এবং স্থানীয় প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুলেখক বলিয়া তাঁহার প্রতিপত্তি পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রাণে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। চিরাভ্যস্ত অপরিমিতব্যয়িতা দোষে তিনি তখনও অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেছিলেন এবং নিজের উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত ব্যবহারের জন্য তাঁহার পারিবারিক জীবনও অশান্তিময় হইয়াছিল। মান্দ্রাজ তাঁহার নিকট কণ্টক-শয্যায় পরিণত হইল। "ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী" রচনার পর এবং তাঁহার প্রথমা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে

তিনি উৎসাহে লিখিয়াছিলেন—"Heigh ho! my stars are brightening" ; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় নাই ; তিনি কেবল বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন মাত্র। নিরাশায় মর্ম্মাহত হইয়া তিনি শেষে বলিতে বাধ্য হইলেন—"হায়! সাংসারিক উন্নতির জন্য যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না" ("I have not thriven so well in the world as I had expected")। বঙ্গদেশে প্রত্যাগমনের জন্য গৌরদাসবাবুর আহ্বান তাঁহার নিকট বড়ই সময়োপযোগী বোধ হইল। তিনি মাতৃভূমির ক্রোড়ে প্রত্যাগমন করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আট বৎসর কাল বাসের পর মান্দ্রাজ ত্যাগ করিলেন।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## মান্দ্রাজ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন—তৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা—বেলগাছিয়া থিয়েটার

স্বদেশে প্রত্যাগমন, পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন

আট বৎসর পরে মধুসূদন মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার এই দীর্ঘ প্রবাসকালের মধ্যে নানাবিষয়ে তাঁহার স্বদেশে অতি গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশ বলিলে লোকে যাহা বুঝে, তাঁহার পক্ষে তাহার কিছুই ছিল না। তাঁহার জনক-জননী লোকান্তরিত হইয়াছিলেন; তাঁহাকে প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া লইবার লোক তাঁহার পিতৃগৃহে কেহই ছিলেন না। কলিকাতায় যে গৃহে তিনি বাল্যে পিতা-মাতার সঙ্গে সুখে বাস করিতেন, তাহা আর একজনের অধিকৃত হইয়াছিল। তাঁহার জন্মভূমিতেও তাঁহার জন্য স্থান ছিল না। তাঁহার স্বসম্পর্কীয়গণের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না; যাঁহারা পারিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার শৈশব-সুহৃদ্‌দিগের মধ্যে কেহ পরলোকগমন করিয়াছিলেন; কেহ স্থানান্তরে গিয়াছিলেন; কেহ তাঁহার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন; কেহ বা, বিস্মৃত না হইলেও তাঁহাকে দেখিয়া আর সেই শৈশবের অনুরাগ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার চতুর্দ্দিকে অপরিচিত মুখমণ্ডল—স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াও তিনি বিদেশী;—রঙ্গভূমি পট-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যেমন অভিনব আকার ধারণ করে, বঙ্গদেশও তাঁহার সম্বন্ধে তেমনই এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল।

মধুসূদন নিজেও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। আটবৎসরব্যাপী প্রবাসের ফলে তাঁহার আকৃতি, প্রকৃতি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলকায় হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কণ্ঠের স্বর অন্যরূপ হইয়াছিল। য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া এবং বিজাতীয় সমাজের সংসর্গে বাস করিয়া তিনি আহারে, পরিচ্ছদে এবং আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে বৈজাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আলোচনার অভাবে তিনি স্বদেশীয় ভাষা বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত কথোপকথন-কালে ইংরাজীভাষায় ও ইংরাজী রীতিতেই মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। ক্বচিৎ যে দুই একটি বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহাও বিকৃত বৈজাতিক স্বরে। হিন্দুকলেজে পাঠের সময় তিনি বাঙ্গালা ভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের জন্য কখনও কখনও যে বলিতেন—"বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল", মান্দ্রাজ প্রবাসের ফলে তাঁহার বাল্যের সেই বিদ্রূপ-বাক্য কিয়ৎপরিমাণে সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

মধুসূদনের নিজের পরিবর্ত্তন

কেবল মধুসূদনেরই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম্ম, ভাষা, প্রত্যেক বিষয়েই এই সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশে অতি গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বাষ্পযানের ও তাড়িত বার্ত্তাবহের প্রচলনে সমাজের সম্মুখে অভিনব কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে লোকের চিন্তা-স্রোতও নূতন পথে ধাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। চতুর্দ্দিকেই পরিবর্ত্তন, পুরাতনের সহিত নূতনের সংগ্রাম। পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে প্রাচ্য ভাষার ও প্রাচ্য সমাজের সংঘর্ষে এক অভিনব শক্তি সমুৎপন্ন হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশকে আন্দোলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সকল বিষয়েই মধুসূদন যে পরিবর্ত্তন-যুগের সূত্রপাত দেখিয়া গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তিনি

সামাজিক পরিবর্ত্তন

তাহাদিগের পূর্ণবিকাশ দর্শন করিলেন। মধুসূদন তখন জানিতেন না যে, তাঁহারও প্রতিভা এই পরিবর্ত্তন যুগ সম্বন্ধে কিরূপ কার্য্য করিবে। ঐশ্বরিক বিধান বলে উপযুক্ত সময়ে তিনি বঙ্গদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

মধুসূদন সাহিত্যসেবক ;—সাহিত্যেরই সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ —রাজনীতির অথবা সমাজ-নীতির সহিত তাঁহার বড় সম্বন্ধ ছিল না।

বঙ্গীয় সাহিত্যের অবস্থা

সেই সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার প্রবাসকালের মধ্যে বঙ্গদেশে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি যখন হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন বাঙ্গালা ভাষার প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের ভাব কিরূপ ছিল, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা করা দূরে থাকুক, বাঙ্গালা ভাষাতে আমার তেমন অভিজ্ঞতা নাই একথা বলা নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে গৌরবজনক মনে করিতেন; কিন্তু মধুসূদন যখন মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতিভাগুণে বাঙ্গালা ভাষা আর এক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মধুসূদনের মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতালপঞ্চবিংশতি, জীবন-চরিত ও শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্নে ও বাবু অক্ষয়কুমারের প্রতিভাগুণে "তত্ত্ববোধিনী" তখন বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় যে ওজস্বী গম্ভীর রচনা হইতে পারে এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি যে কোন বিষয়ই যে ইংরাজী ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাতেও আলোচিত হইতে পারে, তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, তখন তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিপাদন করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং অক্ষয়বাবুর রচনা হইতে ইংরাজী-শিক্ষিত-সম্প্রদায় তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের মাতৃভাষা

অনাদরের সামগ্রী নয়, ক্ষমতাবান্ লেখকের হস্তে তাহা অসাধারণ শক্তি বিকাশ করিতে সক্ষম।

বাঙ্গালা ভাষার প্রতি এইরূপ অনুরাগ-সঞ্চারের সঙ্গে কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে সাধারণের রুচিরও পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইয়াছিল। যতদিন ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, ততদিন সাধারণ বঙ্গীয় পাঠকের রুচি মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ছিল না। এখন যেমন সংবাদপত্র ও কবিতা দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হইয়াছে মধুসূদনের মান্দ্রাজগমনের পূর্ব্বে সেরূপ অবস্থা ছিল না। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্র সংবাদ-প্রভাকর কবিতা-প্রধান ছিল। সাধারণ পাঠকগণ ইহার গদ্যাংশ ত্যাগ করিয়া পদ্যাংশই আদরের সহিত পাঠ করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও সংবাদ-প্রভাকর

মধুসূদনের পূর্ব্বে বাঙ্গালা-কবিতার অবস্থা

গুপ্ত-কবির কবিতা এখন ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে; সুতরাং তিনি যে এক সময় বঙ্গীয় সাহিত্যের উপর কিরূপ একাধিপত্য করিয়াছিলেন, এখন তাহা অনুভব করা সহজ নয়। তাঁহার প্রণীত কোনও পুস্তক প্রকাশিত হইলে, এবং তাঁহার পত্রিকায় কোন রহস্যগর্ভ কবিতা প্রচারিত হইলে, লোকে তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিতেন। তাঁহার ব্যঙ্গ-কবিতাসমূহ লোকের নিকট এত সমাদৃত হইত যে, অনেক সময় প্রভাকরের দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বারা সাধারণের ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করিতে হইত। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকল শ্রেণীর মধ্যেই গুপ্ত-কবির কবিতার অনুরাগী ও অনুকরণকারী লোক বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কবিতাস্রোত ভারতচন্দ্রেরই প্রদর্শিত পথে প্রবাহিত হইতেছিল; তিনিই কেবল আপনার প্রতিভা-গুণে তাহার গতির পরিবর্ত্তন করিয়া-

ছিলেন। তাঁহার সমকালবর্ত্তী কবিতা-লেখকগণের মধ্যে প্রায় এমন কেহই ছিলেন না, যিনি কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার প্রভাবের বশবর্ত্তী না হইয়াছিলেন। সে সময়কার ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ মধ্য-বয়স্কদিগের এবং প্রাচীন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে ত তাঁহার একাধিপত্যই ছিল; নব্য-বয়স্ক ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যেও যাঁহারা তখন কবিতা লিখিতে অভ্যাস করিতেছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার কবিতা আদর্শরূপে গ্রহণ করিতেন। অধিক কি, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এবং সুপ্রসিদ্ধ নাটককার দীনবন্ধু মিত্রও তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মৈস্মরী (Mesmerism)-বিদ্যাবিৎ যেমন মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করেন, ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহার সমকালীন বঙ্গীয় লেখকদিগকে এক দিন সেইরূপ করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন জাতির সাহিত্য চিরদিন ব্যক্তিবিশেষেরই প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিবে, প্রকৃতির নিয়মে তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। উপযুক্ত সময়ে বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের অভ্যুদয় হইয়াছিল; তাঁহার সময় হইতে বাঙ্গালা কবিতার গতি ভিন্নমুখী হইয়াছে।

গুপ্ত-কবির কার্য্য যে স্থানে শেষ হইয়াছিল, মধুসূদনের কার্য্য ঠিক সেইস্থান হইতে আরব্ধ হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার ফলে তখন বঙ্গদেশে এমন এক শ্রেণীর পাঠক আবির্ভূত হইয়াছিলেন যে, গুপ্ত-কবির কবিতায় তাঁহাদিগের তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা ছিল না। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গুপ্ত-কবির কবিতার সমালোচনা স্থলে যথার্থই বলিয়াছেন যে, * ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পর হইতে "খাঁটি বাঙ্গালা কথায় বাঙ্গালীর মনের ভাব খুঁজিয়া পাই না। * * * মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালী কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি; এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া

* ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রকাশিত "জীবন-চরিত"।

কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না।" পাশ্চাত্য শিক্ষারই গুণে যে বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে এই "খাঁটি বাঙ্গালী" কবির তিরোধান ঘটিয়াছে তাহা বলা অতিরিক্ত। অভাব অনুসারেই সৃষ্টি। পাশ্চাত্য শিক্ষা বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয়ে যে অভাব উৎপাদন করিয়া দিয়াছে, আধুনিক বাঙ্গালী কবিগণ তাহাই পূরণ করিতেছেন। গুপ্ত-কবির সময় হইতেই এই পরিবর্ত্তন-যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিজে যদিও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন না, তথাপি ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি-দিগের মুখে শুনিয়া অনেক ইংরাজী কবিতার মর্ম্ম অবগত ছিলেন। পাশ্চাত্য ভাষা প্রচলনের সঙ্গে দেশীয় সাহিত্যের উপর যে একটি নূতন শক্তি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এবং নিজেও কিয়ৎপরিমাণে সে শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার "সর্ব্ববাদিসম্মত স্তোত্র", "Universal Prayer" নামে ইংরাজী সাহিত্যে সুপরিচিত কবিতার আদর্শে ও অনুকরণে রচিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে আলোক মাধ্যাহ্নিক সূর্য্যকিরণ-সদৃশ প্রভায় মধুসূদনে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, ঈশ্বরচন্দ্রে তাহার প্রথম রশ্মি নিপতিত হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রে পাশ্চাত্য ভাবের প্রতিবিম্বন হইলেও

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মধুসূদন

প্রাচ্য ভাবেরই প্রাধান্য; মধুসূদনে ঠিক ইহার বিপরীত। ঈশ্বরচন্দ্রে এক যুগের শেষ, মধুসূদনে অপর যুগের প্রারম্ভ। উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভাবের সমন্বয়ে অনুপ্রাণিত একজন কবি উভয়ের সংযোগে-সূত্ররূপে তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইনি পদ্মিনী-উপাখ্যান-প্রণেতা স্বর্গীয় বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈশ্বরচন্দ্র ও মধুসূদন উভয়েরই সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইনি একের

শিষ্য, অপরের সুহৃদ্। রঙ্গলালবাবুর কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট বর্ত্তমান রহিয়াছে; মধুসূদন তাঁহার পরবর্ত্তী, সুতরাং মধুসূদনের প্রভাব তাঁহার উপর তাদৃশ প্রসারিত হয় নাই; কিন্তু অরুণ যেমন সূর্য্যের আবির্ভাব সূচনা করে, তিনিও তেমনই বঙ্গ-সাহিত্যে মধুসূদনের ন্যায় একজন যুগ-প্রবর্ত্তক কবির আবির্ভাব সূচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "পদ্মিনী-উপাখ্যান", "কর্ম্মদেবী" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রাচীন ও নব্য রীতির সংমিশ্রণে রচিত কাব্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শেষ বয়সের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা, রঙ্গলালবাবুর "পদ্মিনী-উপাখ্যান" এবং তাহার পর মধুসূদনের গ্রন্থাবলী যিনি মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, জীব-জগতে যেমন ক্রমপরিণতি-অনুসারে উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবের আবির্ভাব হয়, মানসিক জগতের বিকাশ-ক্ষেত্র সাহিত্যেও তেমনই শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর কাব্য, ইতিহাস বা দর্শন-শাস্ত্র উদ্ভূত হইয়া থাকে।

কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর মধুসূদনের অবস্থা

এইবার আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া মধুসূদনের নিজের কথা বলিব। মধুসূদন যখন মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তিনি একেবারেই নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। বন্ধুবান্ধবদিগের চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যে তিনি কলিকাতার পুলিশ আদালতে একটি কেরাণীগিরির কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন এবং পরে তথাকার ভাষান্তর-কারীর ( Interpreter ) পদে উন্নীত হইলেন। সাধারণের অজ্ঞাত এবং অপরিচিত ভাবে তাঁহার দিন গত হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন এইরূপে জীবনযাপন করিতে হয় নাই। সেই সময়ে বঙ্গদেশে

নূতন পথে লক্ষ্য

এমন একটি মহৎ অনুষ্ঠান হইয়াছিল যে মধুসূদনের ভাবী জীবনের পথ তাহা দ্বারা পরিষ্কৃত হইল, এবং তিনি আপনার বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত

হইলেন। মধুসূদনের জীবনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা তাহার একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক মনে করিতেছি।

যদিও ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেই নাট্যশাস্ত্রের অনুশীলন হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়, তথাপি বাঙ্গালাদেশে অতি অল্পদিন মাত্র নাটকাভিনয়ের সূত্রপাত হইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের ন্যায় জাতীয় নাট্যশালারও অভ্যুদয় ইংরাজাধিকারে হইয়াছে। ইংরাজ-সমাজ চিরদিনই নাট্যামোদের অনুরাগী। আফ্রিকার শ্বাপদপূর্ণ বনভূমিতেই হউক, আর উত্তর-মেরুর তুষারাবৃত প্রদেশেই হউক, যেখানেই দশজন ইংরাজ আছেন, সেখানেই তাঁহাদিগের জন্য একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কি, সমুদ্রবক্ষবাহী অর্ণবপোতের উপরও তাঁহাদিগের অভিনয়ক্রিয়ার বিরাম হয় না। এদেশে ইংরাজরাজ্যের সূত্রপাত হইতেই তাঁহারা নাট্যশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সকল নাট্যশালায় গমনাগমন হইতে সে সময়কার দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও হৃদয়ে নাটকাভিনয়ের প্রতি অনুরাগসঞ্চার হইয়াছিল; এবং তাহার ফলে কলিকাতার কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা নাটকাভিনয় হইয়াছিল। এইরূপ অভিনয়ের উদ্যোক্তাদিগের মধ্যে পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ সিংহ-পরিবারস্থ রাজা প্রতাপচন্দ্রের ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা এই সময় আপনাদিগের বেলগাছিয়াস্থিত উদ্যানে রত্নাবলী নাটকের অভিনয়ের জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছিলেন। রাজাদিগের উভয় ভ্রাতার তৎকালীন কলিকাতা সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানসমূহের উৎসাহদাতা বলিয়া রাজপুরুষেরা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তদ্ভিন্ন, ইংরাজ, পারসী, ইহুদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই লোকদিগের

সহিত তাঁহাদিগের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠানের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অভিনয়-দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এত অর্থব্যয় করিয়াও তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে না, এবং করিলেও বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাঁহারা অভিনয়ের রসাস্বাদ করিতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া রাজারা স্থির করিলেন যে, রত্নাবলী ইংরাজীতে অনুবাদিত করাইয়া অভিনয়ের সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকদিগকে এক এক খণ্ড প্রদান করিবেন। শুভ-ক্ষণেই তাঁহাদিগের হৃদয়ে এইরূপ সঙ্কল্প উদিত হইয়াছিল; তাঁহাদিগের সেই সঙ্কল্প হইতেই মধুসূদনের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ পরিষ্কৃত হইল।

রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ

কলিকাতার অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্তগৃহের যুবকদিগের ন্যায় বাবু গৌরদাস বসাকও বেলগাছিয়া নাট্যশালার একজন প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন। মধুসূদন তখন মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুলিশ আদালতে কার্য্য করিতেছিলেন। রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করা স্থির হইলে, গৌরদাস-বাবু তাঁহার উপর এই ভার দিবার প্রস্তাব করিলেন। মধুসূদনের নাম বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠাতৃগণের অবিদিত ছিল না। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নাবস্থা হইতেই ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল, এবং "ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী" হইতে অনেকেই ইংরাজী ভাষার উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকারের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজারা আহ্লাদের সহিত গৌরদাসবাবুর প্রস্তাব অনুসারে মধুসূদনের উপর রত্নাবলী অনুবাদের ভার প্রদান করিলেন। এই হইতে রাজাদিগের উভয় ভ্রাতার এবং স্বর্গীয় মহারাজা সার্ (তৎকালে বাবু) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতা আরব্ধ হইল।*

* মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের সহিত ইঁহাদিগের তিনজনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ইঁহাদিগের সাহায্য এবং অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই মধুসূদন তাদৃশ

কবিশক্তির ন্যায় সরস কথোপকথন শক্তিতে মধুসূদন অদ্বিতীয় ছিলেন। যে সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন, পাণ্ডিত্যে, বাক্‌পটুতায় এবং রহস্যনৈপুণ্যগুণে তিনি তাঁহার প্রাণ-স্বরূপ হইতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠাতাদিগের প্রতিষ্ঠাভাজন হইলেন। তাঁহার কৃত অনুবাদ সকলেরই মনোনীত হইল। রাজারা নিজ ব্যয়ে তাহা মুদ্রিত করাইলেন এবং মধুসূদনকে তাঁহার পারিশ্রমিক স্বরূপ পাঁচ শত টাকা দিলেন।

অল্পদিনের মধ্যে সেরূপ প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মধুসূদনের জীবন-চরিতে ইঁহাদিগের বিশেষ পরিচয়-প্রদান নিষ্প্রয়োজন। আমরা কেবল দুই চারিটি কথা বলিয়াই নিরস্ত হইব। মহারাজা সার্ যতীন্দ্রমোহনের নাম এক্ষণে বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই পরিচিত, কিন্তু অনেকে কেবল তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি

এক সময় কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং নিজে যে একজন কিরূপ গুণগ্রাহী, সুপণ্ডিত এবং সুকুমারকলাবিৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। মধুসূদনের জীবনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া মধুসূদন যখন প্রাচীনত্ব-পক্ষপাতী ব্যক্তিমাত্রকেই তাঁহার সাহিত্য-শত্রু-স্থানীয় করিয়াছিলেন, ইনি এবং ইঁহার ন্যায় আরও দুই চারিজন ব্যক্তিই তখন তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। উপযুক্ত স্থলে পাঠক ইঁহার দূরদর্শিতার ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ লালা বাবুর বংশধর ছিলেন। অল্পবয়সে পরলোকগমন করাতে ইঁহাদিগের নাম ও প্রতিপত্তি ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু বঙ্গীয় সমাজ ও বঙ্গীয় সাহিত্য ইঁহাদের নিকট এক সময় বহু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। শিক্ষাবিস্তার, সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক আন্দোলন, সাধারণের হিতকর যে কোনরূপ অনুষ্ঠান হউক, সকল শুভকার্য্যেই ইঁহারা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা এক সময় ইঁহাদিগেরই অর্থসাহায্যে জীবিত ছিল। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের জ্বররোগীদিগের আবাস প্রধানতঃ ইঁহাদিগেরই ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তজ্জন্য পঞ্চাশ সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্‌যোগে সংস্থাপিত সে সময়কার বালিকাবিদ্যালয় সমূহের উন্নতিসাধন কার্য্যে তাঁহারা প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। অন্তঃপুরস্থ মহিলাদের শিক্ষা তখন এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ছিল; রাজা প্রতাপচন্দ্র আপনার দুহিতার জন্য শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিয়া এ সম্বন্ধে প্রথম

রত্নাবলী অভিনয়

এইরূপে অভিনয়ের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই রত্নাবলী প্রথমবার অভিনীত হইল। প্রথম দুই বারের অভিনয়ে কেবল বাঙ্গালী দর্শকগণই উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বারের অভিনয়ে বাঙ্গালী দর্শকদিগের সঙ্গে, ইংরাজ, মুসলমান, ইহুদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই আহূত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা সার্ ফ্রেডারিক হ্যালিডে, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকলেই অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন; বঙ্গদেশে আর কখনও এরূপ ভাবে কোন নাটক অভিনীত হয় নাই। অভিনয়-ক্রিয়া কিরূপ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, এতদিন পরে তাহা বর্ণনা করিয়া

---

পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ-প্রচারের জন্যও তিনি প্রচুর যত্ন ও অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। মধুসূদন ইঁহাদিগের উভয় ভ্রাতার নিকট যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার লেখা হইতে আমরা ইঁহাদিগের সম্বন্ধে যে দুইটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক তাহা হইতে ইঁহাদিগের গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন :—

"Should the drama ever again flourish in India, prosterity will not forget these noble gentlemen—the earliest friends of our rising national theatre". যদি কখনও ভারতবর্ষে আবার নাট্যশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তবে ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ আমাদিগের জাতীয় নাট্যশালার প্রথম সুহৃদ্ এই মহানুভব ব্যক্তিগণকে বিস্মৃত হইবেন না। (শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা)।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুতে তিনি লিখিয়াছেন—"আমাদিগের পরমাত্মীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে দর্শন-কাব্যের উন্নতি বিষয়ে যে কতদূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দর্শন-কাব্য-প্রিয় মহাশয়গণের অবিদিত নহে। আমি এই ভরসা করি যে, মৃত রাজা মহাশয় যে সুবীজ রোপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বৃদ্ধি বিষয়ে অন্যান্য মহাশয়েরা যত্নবান্ হন। এই কাব্য বিসয়ে উক্ত রাজা মহাশয় যে আমাকে কতদূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না যে, আর এ পথের পথিক হই। হায়! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি কেন প্রতিকূলতা প্রকাশ করিলেন?" কৃষ্ণকুমারীর উৎসর্গ-পত্র।

বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। বেলগাছিয়া নাট্যশালার দর্শক ও অভিনেত্রী-গণের মধ্যে যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন,তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, সেরূপ অনুষ্ঠান ইহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কখনও হয় নাই। তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত,সুচারু দৃশ্যপট, সুরুচিসঙ্গত বেশভূষা এবং সর্ব্বোপরি স্বভাবানুযায়ী অভিনয়, যাহা কিছু দর্শককে প্রীত ও বিমুগ্ধ করে, তাহার সকলগুলিরই সেখানে আয়োজন হইয়াছিল। অর্থে ও পরিশ্রমে যাহা সম্ভবপর, তাহার কিছুতেই ত্রুটি হয় নাই। বঙ্গীয় দর্শকের সমক্ষে যেন এক অভিনব স্বপ্নময় রাজ্য অবতারিত হইয়াছিল। অভিনয়-ক্রিয়ার সাক্ষী হিন্দুকলেজের একজন সুযোগ্য ছাত্র এ সম্বন্ধে আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন—"একেই ত নাট্যশালা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; তাহার উপর অর্কেষ্ট্রা যতদূর মনোরম হইতে পারে তাহা হইয়াছিল। ইহাতে রঙ্গভূমির শোভা ইন্দ্রালয়ের ন্যায় হইয়াছিল এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইতে পারে না। শ্রোতামাত্রই মোহিত হইয়াছিলেন এবং আমি, স্বাভাবিক অনেক বিষয়ে সিনিকাল ( Cynical ) আমিও, ক্ষণকাল মোহিত হইয়াছিলাম।" *

রত্নাবলী অভিনয়ের প্রশংসা সমস্ত বঙ্গদেশময় ব্যাপ্ত হইল। সে সময়কার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহ এক-বাক্যে তাহার সুখ্যাতি করিতে লাগিল; সেই সঙ্গে রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদকেরও নাম চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইল। বঙ্গের ছোটলাট ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইতে সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ পর্য্যন্ত সকলেই অনুবাদ দর্শনে পরিতুষ্ট হইলেন।

রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদের প্রশংসা

তৎকালপ্রসিদ্ধ হরকরা-পত্রিকার সম্পাদক এই অনুবাদের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে, "এরূপ বিশুদ্ধ ইংরাজী রচনা আমরা কখনও দেখি নাই। বাঙ্গালীর লেখনী হইতে এরূপ লেখা যে হয়, আমরা

* স্বর্গীয় শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত।

জানিতাম না। কেবল বাঙ্গালী নহে, কলিকাতার মধ্যে অনেক ইংরাজও এরূপ লিখিতে পারিয়াছি বলিয়া আপনা আপনি শ্লাঘা প্রকাশ করিলে অহঙ্কৃত বলিয়া দূষিত হইবেন না।"

মধুসূদনের গন্তব্য-পথ প্রাপ্তি

রত্নাবলীর এই ইংরাজী অনুবাদ হইতে মধুসূদন তাঁহার জীবনের গন্তব্য-পথ প্রাপ্ত হইলেন। যশোমন্দিরে আরোহণের পথ অতীব দুর্লঙ্ঘ্য, কিন্তু একবার তাহার সোপান-পংক্তি দৃষ্টিগোচর হইলে আরোহণকারীকে আর বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না, দৃঢ়পদে অগ্রসর হইলেই তিনি গন্তব্যস্থলে উপনীত হইতে পারেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত সম্বন্ধ মধুসূদনকে তাঁহার চিরপ্রার্থিত যশোমন্দিরে আরোহণের সোপান-পংক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য আর কখনও তাঁহাকে পথভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে হয় নাই। ধীরভাবে অথচ দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া তিনি আপনার গন্তব্য-স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণ রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ বিস্মৃত হইবেন বটে, কিন্তু তাহা মধুসূদনের জীবনের পথ কিরূপে পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল, সে কথা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

# সপ্তম অধ্যায়

## প্রাচ্য কবিদিগের প্রভাবকাল
## শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী এবং তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য-রচনা

[ ১৮৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দ ]

একদিন রত্নাবলীর অভিনয়াভ্যাস (Rehearsal) দেখিতে দেখিতে মধুসূদন গৌরদাসবাবুকে বলিলেন—"দেখ কি দুঃখের বিষয় যে, এই একখান অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন।" গৌরদাস বাবু শুনিয়া বলিলেন—"নাটকখানা যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা আমরাও জানি; কিন্তু উপায় কি! ভাল নাটক পাইলে আমরা রত্নাবলী অভিনয় করিতাম না, কিন্তু ভাল নাটক বাঙ্গালা ভাষায় কোথায়?" মধুসূদন বলিলেন—"ভাল নাটক? আচ্ছা, আমি রচনা করিব।"

বাঙ্গালা নাটক-রচনার সঙ্কল্প

গৌরদাসবাবু শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় মধুসূদনের যতদূর জ্ঞান, তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না। গ্রন্থরচনা দূরে থাকুক, বাঙ্গালা ভাষায় একখানা পত্র লিখিতে হইলে মধুসূদনের শিরঃপীড়া উপস্থিত হইত, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি তখন ভাব-গোপন করিয়া বলিলেন—"ভালই; ইচ্ছা হইলে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।" মধুসূদন বুঝিতে পারিলেন, গৌরদাসবাবু মুখে তাঁহাকে যাহাই বলুন, অন্তরে তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিলেন না; কিন্তু তিনি সে সময় আর কোন কথা বলিলেন না। উপেক্ষায় নিবৃত্ত থাকা মধুসূদনের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

গৌরদাসবাবুর সহিত এইরূপ কথোপকথনের পরদিনই তিনি আসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয় হইতে সে সময়কার প্রচলিত কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, এবং মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই তিনি শর্ম্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ গৌরদাসবাবুকে দেখিবার জন্য দিলেন। যে মধুসূদন ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা রচনায় পৃথিবী লিখিতে "প্র—থি—বী" লিখিয়া আসিয়াছিলেন, সহসা তাঁহার গ্রন্থের এইরূপ পাণ্ডুলিপি পাইয়া গৌরদাসবাবু বিস্মিত হইলেন।* রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহনও গৌরদাসবাবুর মুখে মধুসূদনের নাটক-রচনার কথা শুনিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজী-নবীস্, মান্দ্রাজী সাহেব মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, ইহা সকলেরই পক্ষে যেন বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছিল; পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। ইঁহাদিগের সকলের উৎসাহে মধুসূদন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, শর্ম্মিষ্ঠার অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করিলেন। রাজাদিগের সুহৃদ্ এবং পরিজনদিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিত, নব্য সম্প্রদায়স্থ ও ইংরাজী অনভিজ্ঞ, প্রাচীন সম্প্রদায়স্থ দুই শ্রেণীরই লোক ছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠার দোষ, গুণ সম্বন্ধে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ মতভেদ হইল। প্রাচীন রীতির পক্ষপাতিগণ মধুসূদনের রচনায় নানাবিধ অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত দোষ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু নব্য সম্প্রদায় তাহাতে নিরস্ত হইলেন না। মধুসূদনের ন্যায় তাঁহারাও অলঙ্কার-

---

* ইহার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষকতার জন্য, মধুসূদন প্রতিযোগী পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভূদেববাবুও এই পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন; পরীক্ষার পর মধুসূদন বাহিরে আসিয়া ভূদেববাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই, পৃথিবী কথাটার বানান কি?" ভূদেববাবু যাহা জানিতেন বলিলেন। মধুসূদন তখন মান্দ্রাজ ফেরৎ সাহেব; সাহেবী ঢঙে বলিলেন, Oh no, it must be—প্র—থি—বী।

শাস্ত্রোক্ত দোষ গুণের বিশেষ সংবাদ রাখিতেন না। মধুসূদনের নাটকের ভাষা সুমধুর, বর্ণিত বিষয় চিত্তাকর্ষক এবং অঙ্কিত চরিত্রগুলি স্বভাবানুযায়ী হইয়াছে দেখিয়াই তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইলেন। নাটকখানি প্রাচীন কি আধুনিক রীতি অনুসারে লিখিত, তাহা অনুসন্ধান করিতে তাঁহাদিগের তাদৃশ আগ্রহ হইল না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এই দলের নেতা ছিলেন। তাঁহারা শর্ম্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহা বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন নিজে শর্ম্মিষ্ঠার জন্য কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিলেন। শেষাঙ্কের শিব-স্তোত্র-বিষয়ক সুমধুর সঙ্গীতটি তাঁহারই রচিত। এইরূপে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে রাজারা মধুসূদনকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান পূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠা নিজেদের ব্যয়ে মুদ্রিত করাইলেন।

শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়

শর্ম্মিষ্ঠা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর মহাসমারোহের সহিত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়। রত্নাবলী-অভিনয়-কালের ন্যায় এবারও কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ অভিনয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারও বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকগণের জন্য অভিনীত নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করা হইয়াছিল। মধুসূদন নিজেই নিজের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। নাট্যশালা কিরূপ মনোহর এবং অভিনয়ের আয়োজন কিরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, আমরা পূর্ব্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি। সেইরূপ সুচারু দৃশ্যপট, সেইরূপ প্রকৃতিসঙ্গত অভিনয় এবং সেইরূপ তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত; সুতরাং দর্শকগণ এবারও মোহিত হইলেন। অভিনয়ের প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত নাটকেরও প্রশংসা সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল।

রত্নাবলীর অনুবাদ হইতে মধুসূদন ইংরাজীভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন; শর্ম্মিষ্ঠারচনা হইতে এইবার বাঙ্গালা ভাষাতেও সুলেখক বলিয়া সম্মানলাভ করিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠাতৃগণ ঐশ্বর্য্যে ও সম্ভ্রমে তাৎকালিক কলিকাতা-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের সমাদরে মধুসূদন সাধারণেরও সমাদরভাজন হইলেন। যে সকল ঘটনায় লোকের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়, বিধাতার অনুগ্রহে ও নিজের প্রতিভা-বলে তিনি তাহা প্রাপ্ত হইলেন। প্রকৃতি-দত্ত প্রতিভার সঙ্গে প্রতিভার উৎসাহদাতা বন্ধুও তিনি লাভ করিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রাজোচিত উদারতার সহিত তাঁহার প্রতিভার সম্মান করিলেন। তাঁহাদিগের কৃপায় দুর্ব্বহ ঋণভার বিমোচিত হওয়ায় মধুসূদনের চিত্ত সুস্থ হইল; তিনি উৎসাহের সহিত সাহিত্যের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ-রচনা করিয়া মধুসূদনের ভাগ্যে কিরূপ পুরস্কার মিলিয়াছিল, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ-রচনা দ্বারা এক্ষণে তাঁহার চিরাভিলষিত বাসনা চরিতার্থ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। নাটকরচনাতেই তিনি নিজের শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন; কালবিলম্ব না করিয়া তিনি আর একখানি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ

তাঁহার প্রথম নাটক শর্ম্মিষ্ঠা মহাভারতীয় যযাতি-উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতির সহিত ঋষি-দুহিতা দেবযানীর এবং অসুররাজ কুমারী শর্ম্মিষ্ঠার বিবাহ এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। তাঁহার দ্বিতীয় নাটক পদ্মাবতী গ্রীক্ পুরাণের ছায়াপাতে রচিত হইয়াছে। গ্রীক্ পুরাণের সুপরিচিত সুবর্ণ আপেল উপাখ্যানের

পদ্মাবতী ও শর্ম্মিষ্ঠার অবলম্বনীয় বিষয়

আদর্শে বিদর্ভ-রাজ নীলধ্বজের সহিত মাহিষ্মতীপুরীর রাজকন্যা পদ্মাবতীর মিলন এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। মধুসূদন সর্ব্বাংশে গ্রীক্ পুরাণের অনুকরণ করেন নাই। তিনি পদ্মাবতী নাটকে গদ্য ও পদ্য উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন। পদ্যগুলি অমিত্রচ্ছন্দে লিখিত। এই অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তনের জন্যই মধুসূদনের নাম বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়াছে। যে অবস্থায় তিনি অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তনে প্রণোদিত হইয়াছিলেন,তাহা অতীব বিস্ময়কর। আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

অমিত্রচ্ছন্দ সম্বন্ধে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সহিত কথোপকথন

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত সম্বন্ধ হইতে মধুসূদনের সঙ্গে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের পরিচয় হইয়াছিল। মধুসূদন কবি এবং মহারাজা কাব্যানুরাগী ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্পদিনেই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা উৎপন্ন হইয়াছিল। কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক সময়ে নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেন। মধুসূদন যে সময় তাঁহার শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় একদিন নাটক ও অমিত্রচ্ছন্দ সম্বন্ধে কথা পড়িলে মধুসূদন মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে বলিলেন—"যতদিন বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন না হইবে, ততদিন বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে বিশেষ কোন উন্নতির আশা নাই।" মহারাজা শুনিয়া বলিলেন—"বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ প্রবণতা, তাহাতে যে ইহাতে কোন দিন অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প।" মধুসূদন বলিলেন,—"আমি তাহা মনে করি না। চেষ্টা করিলে আমাদিগের ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।" মহারাজা বলিলেন—"বাঙ্গালা ভাষার গঠন বিবেচনায় ইহাতে অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত হওয়া কোনমতেই সম্ভবপর নহে। ফরাসী ভাষা আমাদিগের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত, কিন্তু আমি যতদূর অবগত আছি, তাহাতে ইহাতেও

অমিত্রচ্ছন্দে রচিত কোন কাব্য নাই।" মধুসূদন বলিলেন, "সত্য; কিন্তু আপনাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষার দুহিতা; এরূপ জননীর সন্তানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।" মধুসূদনের এবং মহারাজার মধ্যে কিয়ৎক্ষণ এইরূপ বাদানুবাদের পর মধুসূদন বলিলেন—"আমাদিগের ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে কি না, আমি আপনাকে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে প্রস্তুত আছি। যদি আমি স্বয়ং অমিত্রচ্ছন্দে কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া আপনাকে দেখাই, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন?" অপর কেহ সে অবস্থায় এরূপ কথা বলিলে হয় ত উপহাসাস্পদ হইতেন; কিন্তু মধুসূদনের শক্তি সম্বন্ধে তখন আর কাহারও অবিশ্বাস ছিল না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, মধুসূদনের কথা শুনিয়া বলিলেন—"ভাল! আমি তাহা হইলে পরাজয় স্বীকার করিব এবং আপনার অমিত্রচ্ছন্দে রচিত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় প্রদান করিব।" আপাততঃ তুচ্ছ ঘটনা হইতে কত সময় যে কত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয়, উপরি উক্ত ঘটনা তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণস্থল। তাঁহাদিগের এই কথোপকথনের ফলে বাঙ্গালা ভাষার পদ্যে যে ভবিষ্যতে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বা মধুসূদন কেহই তখন তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই; কিন্তু সেই হইতে বাঙ্গালা ভাষায় একটি নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; অথবা কেবল নূতন ছন্দ কেন? সেই হইতে বাঙ্গালা ভাষার কবিতাস্রোত এক অভিনব পথে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

মধুসূদন যে পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রচ্ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, উপরিউক্ত ঘটনাই তাহার কারণ। আদ্যোপান্ত অমিত্রচ্ছন্দে একখানি নাটক রচনার জন্য মধুসূদনের তখনই বাসনা ছিল; কিন্তু সেরূপ আমূল পরিবর্ত্তন করিলে তাঁহার গ্রন্থ সাধারণের আদরণীয় হইবে না, এই আশঙ্কায় তিনি পদ্মাবতীর কলিদেবের অংশমাত্র অমিত্রচ্ছন্দে রচনা

করিয়াছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সহিত কথোপকথনের পর হইতে তিনি মনোযোগের সহিত বাঙ্গালা কবিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাল্যে আহার, নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া তিনি যে দুই বাঙ্গালী কবির গ্রন্থ পাঠ করিতেন, অনেক দিনের পর আবার তিনি তাঁহার সেই প্রিয় কবি কাশীদাসের ও কৃত্তিবাসের কাব্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। জননী প্রকৃতির অনুগ্রহে তিনি কবিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। স্বদেশীয় প্রাচীন কবিগণের কাব্য পাঠ করিয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষার প্রবণতা বুঝিয়া লইলেন। পাশ্চাত্য মহাকবিগণের কাব্য হইতে তিনি অমিত্রচ্ছন্দের গঠন-প্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। স্বাভাবিক সঙ্গীত-প্রিয়তা বশতঃ তাঁহার কর্ণ সহজেই শব্দের হ্রস্ব দীর্ঘ নিরূপণে ও বর্ণসংস্থাপন-জনিত মাধুর্য্য অনুভবে সক্ষম হইল। কিয়দ্দিনের মধ্যেই তিনি তিলোত্তমার প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ রচনা করিয়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেখাইলেন। তখন কাহারও আর সন্দেহের কারণ রহিল না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন নিজে এবং স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, মধুসূদন তাঁহার প্রতিজ্ঞাপালনে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সেদিন মধুসূদনের জীবনের যে কি আনন্দের দিন, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার আনন্দে আনন্দিত হইলেন। ডাক্তার মিত্র মহাশয়ের সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহ তখনকার শিক্ষিত-সমাজের অন্যতম মুখপত্র ছিল। তিলোত্তমার প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ তাহাতে প্রকাশিত হইল এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে প্রচুর প্রশংসা করিলেন। কাব্যের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ হইলে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন আনন্দের সহিত তাহার মুদ্রাঙ্কনের প্রতিশ্রুত ব্যয়

তিলোত্তমা-সম্ভব-রচনা

প্রদান করিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিলোত্তমা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

যে দেশে কোন গুণবান্ পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ সৌভাগ্যবান্; কিন্তু যে দেশে গুণবানের সমকালে তাঁহার গুণের সমাদর করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান থাকেন সে দেশ আরও অধিক সৌভাগ্যবান্। বঙ্গভূমির বড়ই সৌভাগ্য যে, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহাদিগের গুণের সমাদর করিবার উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব হয় নাই।

এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দ-পক্ষপাতী লোকের অভাব নাই; কিন্তু তিলোত্তমা-সম্ভব প্রকাশের সময়ে এ অবস্থা ছিল না। সে সময় যাঁহারা ইহার প্রচার সম্বন্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদিগের জাতীয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই সম্মানের পাত্র। অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে মধুসূদন যাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,মহারাজা যতীন্দ্রমোহন তাঁহাদিগের অন্যতম। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় যে কি গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিবে, মধুসূদনের ন্যায় মহারাজাও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কার্য্যের প্রারম্ভে তাহার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ কার্য্যের সূচনা দেখিয়াই তাহার পরিণাম বুঝিতে পারেন এবং সেই জন্যই সমাজে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠা। সাহিত্য-সংসারে তখনও একরূপ অপরিচিতনামা মধুসূদন অপ্রচলিতচ্ছন্দে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। দেশের অনেক কৃতবিদ্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অবজ্ঞার ভ্রূকুটি-নিক্ষেপ করিতেছিলেন; এই সময় ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় মহারাজা যে সেই কাব্যের ভাবী গৌরব সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন, ইহা তাঁহার দূরদর্শিতার

পক্ষে অবশ্যই বিশেষ গৌরবজনক। মধুসূদন তাঁহার তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্য মহারাজাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিলোত্তমার স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে উপহার প্রদানপূর্ব্বক তিনি তিলোত্তমার উৎসর্গ-পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন ;—

তিলোত্তমা-সম্ভব সম্বন্ধে মধুসূদনের ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ভবিষ্যৎ বাণী

"যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য ; কেন না এরূপ পরীক্ষাবৃক্ষের ফল সদ্য পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে, যখন এদেশের সর্ব্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষরস্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয় ত, সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতম মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবে যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না।"*

মধুসূদনের ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইয়াছে কি না, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনও এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও নিষ্ফল হয় নাই। তিলোত্তমা-সম্ভব হইতে বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্যে এক উন্নততর যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মধুসূদন তিলোত্তমার পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলে, মহারাজা তাহার প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন, পাঠক তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, বঙ্গভাষার অমিত্রচ্ছন্দে রচিত প্রথম কাব্য যাঁহার নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি তাহার অনুপযুক্ত নহেন। মহারাজা লিখিয়াছিলেন ;—

I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manuscript তিলোত্তমা in the Poet's own hand-writing! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a monument that marks

* তিলোত্তমার উৎসর্গ-পত্র।

a grand epoch in our literature, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuine province. Time will come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves. I feel sure that my descendants, should I have any, will then be proud to think that the manuscript in the author's autograph of the first blank-verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the poet himself.

তিলোত্তমা-সম্ভব পৌরাণিক সুন্দ-উপসুন্দের উপাখ্যান লইয়া রচিত হইয়াছিল। মধুসূদন সর্ব্বাংশে মূল উপাখ্যানের অনুসরণ করেন নাই; স্থানে স্থানে নিজের মৌলিক কল্পনা প্রদর্শন করিয়া এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনেক কাব্যের ভাব গ্রহণ করিয়া তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন। অমিত্রচ্ছন্দ রচনায় তখনও তিনি পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তিলোত্তমা-সম্ভবের কোন কোন স্থানে অপরিপক্বতা দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহা হইলেও গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে ইহা যে মেঘনাদবধ কাব্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

তিলোত্তমা-সম্ভব বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট কিরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। তিলোত্তমা

তিলোত্তমা-সম্ভব সম্বন্ধে সাধারণের মতামত

প্রকাশের পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর গত হইয়াছে। সুতরাং ইহা যে এক সময় বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে কিরূপ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল, এতদিন পরে তাহা উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা নাই। নিন্দা,

অবজ্ঞা এবং উপহাস অজস্রধারে কবির উপর বর্ষিত হইয়াছিল। তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিবার জন্য অমিত্রচ্ছন্দের বিকৃতি করিয়া কত জনে কত হাস্যোদ্দীপক কবিতা প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতা ক্রমে বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে; এখন আর তাহাদিগের উল্লেখ অনাবশ্যক। নিন্দা, বিদ্রূপ এবং শ্লেষোক্তি সহ্য করিয়া মধুসূদন যেরূপ দৃঢ়তার সহিত তাঁহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই বীরোচিত। ফরাসী কবি ভিক্‌তর হিউগো এবং ইংলণ্ডীয় কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ন্যায় দুই চারিজন পাশ্চাত্য মহাকবির জীবনেই কেবল সেরূপ দৃঢ়তা লক্ষিত হয়। লোকের সমালোচনায় উপেক্ষা-প্রদর্শন বাল্য হইতেই মধুসূদনের অভ্যাস ছিল এবং সেই জন্য তাঁহার চরিত্রের অনেক দোষ সংশোধিত হইতে পারে নাই। কিন্তু অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁহার এই দোষ তাঁহার মঙ্গলের কারণ হইয়াছিল। চিরাভ্যস্ত দৃঢ়তার সহিত বিরুদ্ধবাদীদিগের কথায় উপেক্ষা করিয়া তিনি গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভবভূতি তাঁহার সমকালবর্ত্তী পণ্ডিত-মণ্ডলীর উপেক্ষায় অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক সগর্ব্বে লিখিয়াছিলেন;—

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং, জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা, কালো হ্যয়ং নিরবধির্ব্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

মধুসূদন ভবভূতির এই গর্ব্বিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তিলোত্তমায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। ভবভূতির ন্যায় তাঁহারও ভবিষ্যৎবাণী যে সফল হইয়াছে, তাহা বোধ হয় বলিবার আবশ্যক করে না।

মধুসূদনের এই সময়কার রচিত আরও দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব। শর্ম্মিষ্ঠার পরেই তিনি এই দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম, একেই কি বলে সভ্যতা, এবং দ্বিতীয়, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।

সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থের আবশ্যকতা

দুইখানিই প্রহসন এবং দুইখানিই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার জন্য রচিত হইয়াছিল।* মধুস্থদন বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের ন্যায় এই জাতীয় গ্রন্থেরও সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রহসন সকল দেশেই সামাজিক উপপ্লবের ও অশান্তির নিদর্শক। যখনই কোন সমাজ কোন বিরুদ্ধাচারের প্রাবল্যে উৎপীড়িত হয়, তখনই তাহাতে প্রহসন বা ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। গ্রন্থকারগণ সমাজের শিক্ষক। যখন সমাজে ধর্ম্ম ও সদাচার বিরাজ করে, তখন তাঁহারা শান্ত মূর্ত্তিতে অবস্থান করেন, কিন্তু যখন দুষ্ক্রিয়ার ও কদাচারের প্রাবল্যে সমাজ উপদ্রুত হয়, তখন তাঁহাদিগকে অপরাধীদিগের শাস্তির জন্য সুতীক্ষ্ণ কশা গ্রহণ করিতে হয়। এই হইতেই সাহিত্যে প্রহসনের ও ব্যঙ্গকাব্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। রাজপুত-কবি চাঁদ যথার্থই বলিয়াছেন—"শত্রুর করবালাপেক্ষা কবির কাব্য-শেল সহস্রগুণ তীক্ষ্ণ।" স্বদেশ-নির্ব্বাসিত কুটীরবাসী ভল্টেয়ারের মুখের এক একটি কথায় য়ুরোপের কোন কোন মুকুটধারীর যে অন্তর্দ্দাহ হইত, তাহা সকলেরই পরিচিত। বাস্তবিকও সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কবির মর্ম্মভেদী বাক্যবাণের ভয়ে, শত শত ক্ষমতাবান্ পাষণ্ড আপনাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি সংযত বা গোপনে চরিতার্থ করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু যেমন প্রকৃত বলবান্ পুরুষগণই মহাস্ত্র ব্যবহার করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ কেবল প্রতিভাবান্ পুরুষগণই ব্যঙ্গাস্ত্র প্রয়োগে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। দুর্ব্বল ব্যক্তি দ্বারা প্রযুক্ত হইলে তাহা ত্বক্ ভেদ করে মাত্র, মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

মধুস্থদনের কৈশোর ও যৌবন কলিকাতা-সমাজের যে অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা শান্তিপূর্ণ ছিল না। পাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্টান্তে ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে তখন কলিকাতা-সমাজ

* বিশেষ কারণে কোনখানিই অভিনীত হয় নাই।

উপদ্রুত ও অশান্তিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তথায় শিক্ষিত-নামধারী এমন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, তাঁহারা সভ্যতার ও সমাজ-সংস্কারের নামে স্বেচ্ছাচারের ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন। দলবদ্ধ হইয়া মদ্যপান, হিন্দুশাস্ত্র-নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ এবং স্বদেশীয় প্রত্যেক আচার ব্যবহারে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন, ইহাই তাঁহাদিগের নিকট সভ্যতার ও সমাজ-সংস্কারের চরমসীমা বলিয়া বিবেচিত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের নিকট অজ্ঞ ও কৃপাপাত্র বলিয়া উপেক্ষিত হইতেন এবং শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ তাঁহাদিগের নিকট অবিশ্বাস্য ও কুসংস্কার-পূর্ণ বলিয়া অনাদৃত হইত। লোকে ইঁহাদিগকে "ইয়ং-বেঙ্গল" বলিত। এই ইয়ং-বেঙ্গলের ভয়ে কলিকাতা-সমাজ একদিন তটস্থ হইয়াছিল। মধুসূদন নিজে এবং তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সুহৃদ্‌গণের মধ্যে অনেকে এই "ইয়ং-বেঙ্গল" সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূ্ত ছিলেন। তাঁহার "একেই কি বলে সভ্যতা" এই শ্রেণীকেই লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল।

কিন্তু "একেই কি বলে সভ্যতা" তাৎকালিক সমাজের একাংশ মাত্র চিত্রিত করিয়াছিল; অপরাংশ চিত্রণেরও প্রয়োজন ছিল। কেবল ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়েরই অনাচারে হিন্দু-সমাজ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা নয়; বকধর্ম্মা প্রাচীন সম্প্রদায়ের কুব্যবহারে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মধুসূদনের সময়ে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোকের কলিকাতায় ও তাহার নিকটবর্ত্তী পল্লীসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাহিরে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও ইঁহাদিগের চরিত্র ও ব্যবহার হিন্দুশাস্ত্রসমূহকে উপহাস করিত। মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন "বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া" এই শ্রেণীর লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মধুসূদনের প্রহসনদ্বয়ের যদিও ক্রমশঃ অপ্রচলন

হইতেছে, তথাপি গ্রন্থোল্লিখিত বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা ও চরিত্র-চিত্রণ-পটুতা সম্বন্ধে অতি অল্পসংখ্যক বঙ্গীয় প্রহসনই অদ্যাপি ইহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে।

মধুসূদন কেবল তিন বৎসর মাত্র বাঙ্গালা-সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ শর্ম্মিষ্ঠা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রচারিত হইয়াছিল; ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া, পদ্মাবতী-নাটক এবং তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, উপর্য্যুপরি আর এই চারিখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; সুতরাং বাঙ্গালা-সাহিত্যের এ বিভাগে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইলেন। প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি তখনও উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করিলেও নব্য সম্প্রদায় তাঁহার গুণের একান্ত পক্ষপাতী হইলেন এবং প্রাচীন নব্য সকলেই এক-বাক্যে তাঁহাকে একজন অসাধারণ প্রতিভাবান্ ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সাহিত্য-শিল্পশালায় তাঁহার শিক্ষাকালের এই রূপে অবসান হইল এবং তিনি স্বাধীনভাবে নিজের উদ্ভাবনীশক্তি প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার উদ্যমের ফল কি হইয়াছিল পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

# অষ্টম অধ্যায়

## পাশ্চাত্য কবিদিগের প্রভাব-কাল

### মেঘনাদবধ-কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য এবং কৃষ্ণকুমারী-নাটক রচনা

[ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ ]

মেঘনাদবধ-রচনা

শর্ম্মিষ্ঠা ও তিলোত্তমা-সম্ভব রচনা হইতে মধুসূদন যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের এই অংশে আমরা তাহার ফল দর্শন করি। ভাষার লালিত্য, ভাবের উৎকর্ষ, রচনার গাম্ভীর্য্য এবং গ্রন্থোল্লিখিত চরিত্র-সমূহের সৌষ্ঠব প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে তাঁহার এই সময়কার রচিত গ্রন্থগুলিই তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মেঘনাদবধ, কৃষ্ণকুমারী, ব্রজাঙ্গনা এবং বীরাঙ্গনা এই সময়ের অন্তর্ভূত। ইহার পর হইতে মধুসূদনের প্রতিভার পতন ঘটিয়াছে। একদিকে এই সময় যেমন তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, অপরদিকে তেমনই তাঁহার পাশ্চাত্য-ভাব-প্রবণতাও এই সময় পূর্ণতালাভ করিয়াছে। শর্ম্মিষ্ঠা ও তিলোত্তমা-সম্ভবে তিনি বহুল পরিমাণে সংস্কৃত কাব্যসমূহের ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই সময়কার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ব্রজাঙ্গনা ভিন্ন অপর সকলগুলিতেই প্রাচ্য ভাব অপেক্ষা পাশ্চাত্য ভাবেরই প্রাধান্য লক্ষিত হইবে। ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারী এবং মেঘনাদ-বধ প্রায় একই সঙ্গে আরব্ধ এবং একই সঙ্গে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তিলোত্তমা-সম্ভব প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পরেই মধুসূদন মেঘনাদ-বধ-কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথমাংশ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়াংশ পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মধুসূদনের কোন গ্রন্থেরই প্রকৃত সমালোচনা বর্ত্তমান সংস্করণের উদ্দেশ্য নয়। তবে মেঘনাদবধ রচয়িতার জীবনীতে মেঘনাদবধের আলোচনা না থাকিলে ইহা অসম্পূর্ণ থাকিবে বলিয়া আমরা সংক্ষেপে দুই একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিব।

মেঘনাদবধের অবলম্বনীয় বিষয়

মেঘনাদবধ রামায়ণের চিরপরিচিত পুরাতন কথা অবলম্বনে বিরচিত। রাক্ষসরাজের পুত্র বীরকেশরী মেঘনাদের মৃত্যু ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু রামায়ণের সেই পুরাতন কথা লইয়া রচিত হইলেও ইহাতে অনেক নূতন কথা আছে। ইহার রাক্ষসগণ রামায়ণের বীভৎসরসের আধার, নরশোণিতপ্রিয় জীব নহেন। বীরত্বে, গৌরবে, ঐশ্বর্য্যে এবং শারীরিক সৌন্দর্য্যে সাধারণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা মনুষ্য। আচার-ব্যবহারেও আর্য্যসমাজ হইতে তাঁহাদিগের সমাজের কোন পার্থক্য নাই। আর্য্য নরনারীগণের ন্যায় তাঁহারাও যজ্ঞ ও দেবপূজা করেন; ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং গঙ্গাজল তাঁহাদিগেরও পূজার অঙ্গ। তাঁহাদিগেরও কুললক্ষ্মীগণ স্বামী-পুত্রের কল্যাণের জন্য শিবারাধনা করেন এবং সতী পতির সঙ্গে চিতারোহণ করেন। তাঁহাদিগেরও গৃহে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রীরূপে রাজলক্ষ্মীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত এবং মহামায়া তাঁহাদিগেরও পুরাধিষ্ঠাত্রী। আর্ষ রামায়ণের যে নরমাংসাশী রাক্ষসরাজ সীতাদেবীকে "প্রাতরাশ"রূপে ভক্ষণ করিবে বলিয়া মধ্যে মধ্যে ভীতি প্রদর্শন করিতেন, মেঘনাদ-বধের পাঠক তাঁহাকে দেখিতে পান না। মেঘনাদবধে রামায়ণে অনুল্লিখিত এমন কি রামায়ণবিরোধী অনেক কথাও লক্ষিত হয়। রামায়ণের ন্যায় ইলিয়াড ও ইনিয়াড প্রভৃতি পাশ্চাত্য কাব্যসমূহের অনেক ঘটনা পরিবর্ত্তিত আকারে ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। রামায়ণের আদর্শ হইতে ইহার আদর্শও ভিন্ন। মহর্ষির প্রদর্শিত মার্গ

পরিত্যাগ করিয়া কবি ইহাতে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের অপেক্ষা রাক্ষস-পরিবারদিগেরই প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

কাব্যের সর্গ-বিভাগ

মেঘনাদবধ-কাব্য নয় সর্গে বিভক্ত। তিন দিনের ও দুই রাত্রির ঘটনা এই নয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। ভগ্ন-দূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজকর্ত্তৃক মেঘনাদকে সেনাপতি পদে অভিষেক প্রথম দিবসের ঘটনা। হরপার্ব্বতীর অনুগ্রহে লক্ষ্মণের স্বপ্ন-দর্শন ও অস্ত্রলাভ, রাত্রির ঘটনা। দেবরাজের ও শচীদেবীর কৈলাসে গমন, লক্ষ্মণের দেবীপূজা, প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ এবং সীতাদেবীর সঙ্গে সরমার কথোপকথন প্রভৃতি কাব্যের অনেক প্রধান ও উৎকৃষ্ট অংশ এই রাত্রির ঘটনারূপে বর্ণিত হইয়াছে। মেঘনাদের মৃত্যু ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল, দ্বিতীয় দিব-সের ঘটনা। রামচন্দ্রের যমপুরীদর্শন দ্বিতীয় রাত্রির এবং প্রমীলার চিতারোহণ, তৃতীয় দিবসের ঘটনা; কিন্তু কবির অনুপম কল্পনা-গুণে এই তিন দিবস মাত্র ব্যাপী ঘটনা অতি দীর্ঘ কালের কার্য্য বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। আমরা বর্ত্তমান বিস্মৃত হইয়া অতীতের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাই এবং নরলোকবাসী হইয়াও কল্পনানেত্রে দেবলোকের অনুপম চিত্র দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। কবিবর হেমচন্দ্র ইহার সম্বন্ধে যথার্থই লিখিয়াছেন—"সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানা দেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়নপূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে; কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজীতে যে অপূর্ব্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্নসহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন।"

"যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়ানক প্রাণী ও পদার্থ সমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়-লক্ষ্য চিত্র-ফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে; যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল

বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়; যাহাতে দেব, দানব, মানব-মণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্য-কলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়; যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ, কখন বা করুণ রসে আর্দ্র হইতে হয় এবং বাষ্পাকুললোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি?"

দোষ গুণ সমস্ত লইয়া মেঘনাদবধ যে বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য, তাহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত; কিন্তু ইহার অনেক ঘটনা ও ভাব অন্যান্য কাব্য হইতে গৃহীত বলিয়া কেহ কেহ মধুসূদনের প্রতিভা ও মৌলিকতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। তাঁহারা বলেন যে, মেঘনাদবধের প্রতি পত্রে যখন অন্যান্য মহাকবিগণের হস্তচিহ্ন বর্ত্তমান, তখন ইহাতে কবির গুণপণা বা উদ্ভাবনীশক্তি কোথায়? কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, কতকগুলি মৃত জীবের কঙ্কাল হইতে অস্থি সংগ্রহ করিয়া একটি অভিনব জীব সৃষ্টি করা যেরূপ কঠিন, অন্যান্য কাব্য হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া একখানি নবীন কাব্য প্রণয়ন করাও সেইরূপ কঠিন। তাঁহাদিগের আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, মিল্টন এবং সেক্সপিয়ারকেও গৌরবচ্যুত হইতে হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাকবিগণের কাব্যের ভাব এখনও অক্ষুণ্ণ মহাসমুদ্রের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে, বঙ্গসাহিত্যে আর একজন মধুসূদন জন্মগ্রহণ না করিলে আর একখানি মেঘনাদবধ রচিত হইবে? প্রকৃতির রাজ্যে উপাদানের অভাব নাই, কিন্তু সেই সকল উপাদান হইতে সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া নূতন কিছু সৃজন করাতেই প্রকৃত প্রতিভার পরিচয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যে মেঘনাদ-বধ-কাব্যের স্থান

মধুসূদন তাঁহার কাব্যে যে উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিলেও ইহা বাঙ্গালাভাষায় যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, কেবল তাহারই জন্য ইহা অমরতা লাভ করিবে। জাতীয় প্রবণতার ন্যায় জাতীয় শক্তিও সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। মধুসূদন যে তাঁহার কাব্যে বীরোচিত ভাষা ও বীরোচিত ভাব সন্নিবিষ্ট করিতে পারিয়াছেন, ইহা আমাদিগের জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাপ্রদ। ক্ষীণকায়, নির্জ্জীব বাঙ্গালীর অভ্যন্তরে অন্তর্নিহিত শৌর্য্য ও তেজস্বিতা না থাকিলে এরূপ কাব্য কখনই রচিত হইতে পারিত না। কবি তাঁহার কাব্যের প্রথমে যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন তাহা সফল হইবে। মধুমক্ষিকার ন্যায় নানা দেশীয় কাব্যকুসুম হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া, তিনি যে অপূর্ব্ব মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন গৌড়ীয় জনগণ তাহাতে সত্যই,

"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"।

**মেঘনাদবধ-কাব্যের সমাদর**

তিলোত্তমা-সম্ভব বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট কিরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মেঘনাদবধেরও সমাদর সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। বঙ্গের শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত সমতল ক্ষেত্রে অকস্মাৎ কোন পর্ব্বত-শৃঙ্গের উত্থান দেখিলে দর্শকদিগের হৃদয়ে যেরূপ বিস্ময় জন্মে, মেঘনাদবধকাব্য বঙ্গীয় পাঠকগণের হৃদয়ে একদিন সেইরূপ বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। যেন বীণাধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে তন্দ্রালস কর্ণে গম্ভীর ভেরী-নিনাদ প্রবেশ করিল; যেন নির্ঝরিণীর কুলু কুলু নিনাদে অভ্যস্ত শ্রবণে জলপ্রপাতের ভীষণ গর্জ্জন প্রবিষ্ট হইল। শত্রু, মিত্র সকলেই চমকিত হইলেন। যে শ্রেণীর পাঠকগণ তিলোত্তমা-সম্ভব পাঠ করিয়া মধুসূদনকে উন্মাদ-প্রলাপী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন,

তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তখনও তাঁহাকে উপহাস করিতে নিরস্ত হইলেন না; কিন্তু চিন্তাশীল ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিলেন যে, মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষাকে কি অমূল্য উপহার প্রদান করিয়াছেন। অমিত্রচ্ছন্দ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রায় প্রথমাবস্থায় অনুকূল ছিল না, মেঘনাদবধ পাঠ করিয়া তাঁহার পূর্ব্বসংস্কার দূরীভূত হইল; তিনি মধুসূদনের গুণের একান্ত পক্ষপাতী হইলেন। কলিকাতার তাৎকালিক ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা মধুসূদনের প্রতিভার সম্মান করিয়া সম্মানিত ও বঙ্গভাষানুরাগিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে রাজা প্রতাপচন্দ্রের, রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের নাম আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অভিনন্দন

মেঘনাদবধের সঙ্গে মহাভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়েরও নামোল্লেখ আবশ্যক।* মধুসূদন যখন পুলিশ আদালতে কার্য্য করিতেন, তখন কালীপ্রসন্নবাবুকে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে মধ্যে মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে হইত। সেই হইতে তাঁহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে বয়োগত পার্থক্য থাকিলেও, হৃদ্গত কোমলতায় ও মধুরতায় অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। দুই জনেরই প্রকৃতি স্বভাবতঃ অতি সরল ও স্নেহপ্রবণ ছিল; সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা পরস্পরের প্রতি বিশেষরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন। প্রতিভাবানের প্রতি সমুচিত সমাদর-প্রদর্শন

* মহাভারতের অনুবাদ হইতে কালীপ্রসন্নবাবুর নাম বঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই পরিচিত হইয়াছে; কিন্তু মাতৃভাষার সেবার জন্য তিনি যে কিরূপ যত্ন, কিরূপ পরিশ্রম ও কিরূপ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, অতি অল্প লোকই তাহা অবগত আছেন। ত্রিংশৎবর্ষ মাত্র বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি স্বদেশীয় নাট্যশাস্ত্রের উন্নতির ও মাতৃভাষার সমৃদ্ধি-সাধনের জন্য ন্যূনাধিক আড়াই লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।

এবং নির্ভীকচিত্তে নিজের মতামত প্রকাশ করা কালীপ্রসন্নবাবুর চিরন্তন অভ্যাস ছিল। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন হইতেই তিনি মধুসূদনের গুণের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং লঘুচেতা লেখকগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলেন দেখিয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। মেঘনাদবধ প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বিদ্যোৎসাহিনী-সভা নামে এক সাহিত্য-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভার সভ্য ছিলেন। কালীপ্রসন্নবাবু এক্ষণে সেই সভা হইতে মধুসূদনকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিবার অভিলাষ করিয়া কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মধুসূদনের গুণানুরাগী ব্যক্তিগণ সকলেই সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। কালীপ্রসন্নবাবু তাঁহাদিগের ও বঙ্গের সাধারণ শিক্ষিত-মণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে মধুসূদনকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন-পত্র ও একটি রৌপ্যনির্ম্মিত মূল্যবান পানপাত্র উপহার প্রদান করিলেন। এতদিন মধুসূদনের বন্ধুগণ, কেবল ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার প্রতিভার সম্মান করিয়া আসিতেছিলেন; কালীপ্রসন্নবাবু বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে অভিনন্দন করিয়া এইবার তাঁহাকে প্রকাশ্যরূপে সম্মানিত করিলেন। সাধারণ বঙ্গসমাজও কালীপ্রসন্নবাবুর কার্য্যের অনুমোদন করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। এক বৎসরের মধ্যেই মেঘনাদের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইল, এবং দ্বিতীয় সংস্করণের সময় স্বর্গীয় কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার এক সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়া গ্রন্থের সঙ্গে প্রকাশিত করিলেন। তদ্ভিন্ন বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি আরও অনেক গুণগ্রাহী ব্যক্তি সংবাদপত্রের স্তম্ভে ও সভাস্থলে তাহার দোষ গুণ আলোচনা করিয়া গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত করিলেন। মধুসূদনের বাল্যাবধি পরিপোষিত আশা এতদিনে চরিতার্থ হইল। নিন্দা, উপহাস এবং কটূক্তিতে ভ্রূক্ষেপ

না করিয়া তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার সহিত যে পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, এতদিন পরে তাহার সীমাস্থলে উপনীত হইলেন। ধর্ম্মে হউক, সামাজিক কার্য্যে হউক বা সাহিত্যে হউক যাঁহারা কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে প্রায়ই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়। তাঁহাদিগের মৃত্যুর পরই লোকে তাঁহাদিগের কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান করেন; জীবিতাবস্থায় সম্মান তাঁহাদিগের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। কিন্তু মধুসূদনকে এ বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণ সৌভাগ্যবান্ বলিতে হইবে। নিজের কর্ম্মদোষে জীবনের শেষাবস্থায় কষ্টভোগ করিলেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার স্বদেশীয় ও সমকালবর্ত্তিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার প্রতিভার সম্মান করিয়াছিলেন।

মেঘনাদবধ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইয়াছে; এইবার ব্রজাঙ্গনা ও কৃষ্ণকুমারী-নাটক সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব। মধুসূদনকে "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "তিলোত্তমাসম্ভব" এক সঙ্গে রচনা করিতে দেখিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাবু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন;—

"গ্রন্থকার যখন এক হস্তে এরূপ হাস্যরসোদ্দীপক চিত্র অঙ্কনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি অপর হস্তে কিরূপে তিলোত্তমাসম্ভবে মিল্টনের ন্যায় গাম্ভীর্য্য প্রকটিত করিলেন, তাহা চিন্তা করিলে আমার বিস্ময় জন্মে।"* "তিলোত্তমাসম্ভব" ও "একেই কি বলে সভ্যতা" এক সঙ্গে রচনা যদি বিস্ময়ের বিষয় হয়, তবে মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা এক সঙ্গে রচনা তদপেক্ষা শতগুণ অধিক বিস্ময়কর। একদিকে রণভেরীর দিগন্তভেদী সুগভীর নিনাদ, অপরদিকে মলয়-মারুত-সমানীত সুমধুর

* "It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama."

বংশীধ্বনি; একদিকে স্বর্গ ও নরকের বিস্ময়কর দৃশ্য, অপর দিকে বাসন্ত-কুসুম-শোভিত, পিককুলনিনাদিত বৃন্দাবনের চারু চিত্র যুগপৎ শ্রবণ ও দর্শন করিলে পাঠককে স্তম্ভিত ও মোহিত হইতে হয়। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন না করিয়া মিত্রচ্ছন্দে এবং বীররসের প্রবর্ত্তন না করিয়া আদিরসে গ্রন্থরচনা করিলেও মধুসূদন বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে কিরূপ স্থান লাভ করিতেন, ব্রজাঙ্গনাকাব্য হইতে আমরা তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিয়াছেন, বৃন্দাবন শূন্য; বৃন্দাবনের সকলই আছে; সেই কলকলনাদিনী যমুনা, সেই শ্যামশোভাময় তমাল-কুঞ্জ, সেই চির-পরিচিত ময়ূর ময়ূরীগণ, সেই কুসুমগন্ধবাহী মলয় সমীরণ, সকলই আছে; এখনও সেখানে "মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি, প্রেমানন্দ মনে।" কিন্তু রাধিকার হৃদয় শূন্য—রাধিকা বিরহে উন্মাদিনী; তাঁহার এই উন্মাদভাব ব্রজাঙ্গনার বর্ণনীয় বিষয়। অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যের ন্যায় ইহাতে ভাববৈচিত্র্য নাই। কবি একবারে বিগলিত-ধারা রাধিকার বিষাদিনী মূর্ত্তি পাঠকের সম্মুখে অবতারিত করিয়াছেন। আঠারটি কবিতায় ব্রজাঙ্গনা সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার ভাষা মধুসূদনের গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর ও সংস্কৃতভাবাপন্ন। সম্ভবতঃ জয়দেবের ও বিদ্যাপতির ভাষার আদর্শে মধুসূদন তাহা গঠন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকুমারী নাটক

ব্রজাঙ্গনার সুমধুর বংশীধ্বনির সঙ্গে কুমারী কৃষ্ণার মর্ম্মভেদী বিষাদোচ্ছ্বাসও কবির লেখনী দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। মহারাণা প্রতাপসিংহের বংশধর, উদয়পুরাধিপতি মহারাজা ভীমসিংহের দুহিতা কৃষ্ণকুমারীর বিষাদময় জীবনের আখ্যায়িকা কৃষ্ণকুমারী নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। সীতা ও দময়ন্তী যে বংশের কুলবধূ, কৃষ্ণকুমারী সেই পবিত্র সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; লোকে তাঁহাকে আদর করিয়া রাজস্থানের

কুসুম বলিয়া ডাকিত। কৃষ্ণকুমারীর রূপ গুণে মোহিত হইয়া জয়পুরের অধীশ্বর জগৎসিংহ এবং মরুদেশের অধীশ্বর মানসিংহ তাঁহার পাণি-প্রার্থী হন, এবং উভয়েই প্রতিজ্ঞা করেন যে, কৃষ্ণকুমারীকে প্রাপ্ত না হইলে উদয়পুর ধ্বংস করিবেন। কৃষ্ণকুমারীর পিতা রাজা ভীমসিংহের অবস্থা তখন এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। কৃষ্ণকুমারীই সকল অশান্তির মূল স্থির করিয়া তিনি কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার জন্য আদেশ দান করেন। চারুশীলা কৃষ্ণা বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সংক্ষেপে ইহাই কৃষ্ণকুমারীর ঐতিহাসিক কথা। মধুসূদন ইতিহাসের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু খড়্গাঘাত দ্বারা ঘটিয়াছিল, এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। মধুসূদনের নাটক সমূহের মধ্যে কৃষ্ণকুমারীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। করুণ রসের উদ্দীপনে তিনি যে কিরূপ নিপুণ ছিলেন, ইহা হইতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাঙ্গালা সাহিত্যে মধুসূদনের নাটকসমূহের কার্য্য

মধুসূদনের কাব্যসমূহের ন্যায় তাঁহার নাটকগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। এক্ষণে দিন দিনই তাহাদিগের অপ্রচলন হইয়া আসিতেছে। মধুসূদন যে ভাষায় নাটক রচনা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা হইতে তাহা ক্রমশঃ স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে; লোকের রুচির ও মানসিক প্রবণতারও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; সুতরাং তাহাদিগের লুপ্ত-গৌরব আর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জীব-জগতে যেমন এক শ্রেণীর কার্য্য শেষ হইলে আর এক শ্রেণীর জীব তাহাদিগের স্থান অধিকার করে, সাহিত্য জগতেও তেমনই এক জাতীয় গ্রন্থের বিলোপ ঘটিলে, আর এক জাতীয় গ্রন্থ তাহাদিগের স্থলাধিকারী হয়। কিন্তু তজ্জন্য বিলুপ্ত জীবের

বা বিলুপ্ত গ্রন্থের কার্য্যকারিতা ফলহীনা হয় না। মধুস্থদনের নাটক সমূহের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এক সময়ে তাহারা নবোদ্ভিন্ন বঙ্গসাহিত্যের যে উপকার করিয়াছিল, তাহা উত্তরকালীন নাটকীয় ইতিহাসে অবশ্যই স্মরণীয় হইবে।

# নবম অধ্যায়

## বীরাঙ্গনা-কাব্য রচনা ও ইংলণ্ড-গমন

[ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ ]

পারিবারিক কথা

মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের আলোচনায় আমরা অনেক কাল তাঁহার পারিবারিক জীবনের কোনও প্রসঙ্গ করিতে পারি নাই। পাঠকবর্গের কৌতূহল উদ্দীপিত হইতে পারে, তাহাতে এমন কোন উল্লেখ-যোগ্য ঘটনাও ছিল না। পূর্ব্বের ন্যায় তিনি পুলিস-আদালতে কার্য্য করিতেছিলেন। নিজের বেতন, পুস্তক বিক্রয়ের আয়, এবং পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাঁহার যে অর্থাগম হইত, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় স্বচ্ছন্দে তাঁহার দিনপাত হইত। কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছিল; এবং বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া তাঁহার নাম বঙ্গসমাজে সুপরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং সাধারণতঃ যে সকল সামগ্রী লইয়া মনুষ্য পারিবারিক জীবনে সুখী হয়, তাহার কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না; অথচ, একদিনেরও জন্য তিনি সুখী ছিলেন না। সুখ বাহিরের কোনও সামগ্রীর উপর নির্ভর করে না; সুখ মনুষ্যের নিজের মনে ও আত্মসংযমে; কিন্তু মনকে কেমন করিয়া সংযত ও সমাহিত রাখিতে হয়, মধুসূদন তাহা জানিতেন না; সুতরাং ধন, যশ, পরিবারবর্গের স্নেহ, কিছুই তাঁহাকে তৃপ্তিদান করিতে পারে নাই। বাহিরে লোকে দেখিত, মধুসূদন বিলাসী, আমোদনিরত ও উদ্বেগশূন্য; কিন্তু অভ্যন্তরে তাঁহার হৃদয় বিষম যন্ত্রণায় দগ্ধ হইত। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে তিনি এই সময়কার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* "আত্ম-বিলাপ" নামক একটি কবিতা লিখিয়া

* ১৮৬১ খৃঃ অঃ আশ্বিন-মাস।

ছিলেন। এই কবিতাটি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কিরূপ অতৃপ্তির ও অশান্তির মধ্যে মধুসূদনের জীবন অতিবাহিত হইত। শান্তিদাতার উপর নির্ভর না করিয়া, তিনি যে সাংসারিক সামগ্রীতে শান্তির আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাহার উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রেমের কুসুমহার নিগড়রূপে তাঁহার চরণযুগল আবদ্ধ করিয়াছিল; মণি আহরণ করিতে যাইয়া বিষম বিষে তাঁহার শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছিল এবং কুসুম সংগ্রহ করিবার সময়ে মাৎসর্য্য-কীট বিষদশন দ্বারা তাঁহাকে দংশন করিয়াছিল। নিজের জীবনের এই

"আত্মবিলাপ"

বিষাদময় অভিজ্ঞতা মধুসূদন তাঁহার আত্ম-বিলাপ কবিতায় অতি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর শ্যামাপক্ষী নামক একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন যে, "বিহগের আর্ত্তনাদ মনুষ্য অনেক সময় সঙ্গীত বলিয়া ভ্রম করে।* তাঁহার এই আত্মবিলাপও অনেকে কেবল সুমধুর কবিতা বলিয়া উপভোগ করেন; কিন্তু যাঁহারা কবির জীবনের ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত, তাঁহারা বুঝিবেন যে ইহা শ্রুতি-সুখকর কবিতামাত্র নহে; ইহা যন্ত্রণা-নিপীড়িত কবির মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ। আত্মবিলাপ কবিতাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

## আত্ম-বিলাপ

( ১ )

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়! তাই ভাবি মনে!
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়, ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন ;—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ;—একি দায়!

* "রোদন নিনাদ কিরে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীতধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি?
চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলী—শ্যামাপক্ষী।

( ২ )

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ? জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি কতদিন রবে ?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে নিত্য কিরে ঝলমলে,—
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বু-মুখে সদ্যঃপাতি ?

( ৩ )

নিশার স্বপন সুখে সুখী যে কি সুখ তার ? জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভা দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার, পথিকে ধাঁধিতে !
মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষ-ক্লেশে ;
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

( ৪ )

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে ; কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে উড়িয়া পড়িলি।
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে।

( ৫ )

বাকি কি রাখিলি, তুই ! বৃথা অর্থ অন্বেষণে, সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী ;
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন ! কেমনে ?

( ৬ )

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়, কব তা কাহারে !
সুগন্ধি-কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায় কাটিতে তাহারে ;—
মাৎসর্য্য বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ।
এই কি লভিলি ফল অনাহারে, অনিদ্রায় ?

( ৭ )

মুকুতা-ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জলতলে ফেলিস পামর !
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন ?
হায় রে ভুলিবি কত আশার কুহকছলে !"

মনের এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেও মধুসূদন যে ধীরভাবে গ্রন্থরচনায় সময়ক্ষেপ করিতে পারিতেন ইহাই আশ্চর্য্য; কিন্তু গ্রন্থরচনাই তাঁহার সান্ত্বনার একমাত্র উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মর্ম্মান্তিক যাতনা বিস্মৃত হইবার জন্যই তিনি অনেক সময় বাগ্দেবীর চরণে শরণাগত হইতেন। যে সময় অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন, সেই সময়েই তাঁহার আর একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ বীরাঙ্গনা-কাব্য রচিত হইতেছিল। তাঁহার পারিবারিক জীবনের আলোচনা অপেক্ষা তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের আলোচনাই অধিকতর প্রীতিপ্রদ। আমরা সেই জন্য তাঁহার পারিবারিক কথা ছাড়িয়া তাঁহার বীরাঙ্গনা-কাব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

**বীরাঙ্গনা-কাব্যে গম্ভীর ও কোমল ভাবের সম্মিলন**

মেঘনাদবধে যেমন মধুসূদনের প্রতিভার গম্ভীর এবং ব্রজাঙ্গনায় যেমন তাহার কোমল অংশের পরিস্ফুটন হইয়াছে, বীরাঙ্গনা-কাব্যে তেমনই এই উভয়ের সম্মিলন হইয়াছে। মধুসূদন তাঁহার একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "মেঘনাদবধের পর বীররস বিষয়ে অভিনব উদ্যম কেবল পুনরুক্তি মাত্র হইবে; গীতিকবিতারও দিকে আমার প্রবণতা আছে, আমি সেই দিকে চেষ্টা করিব।" মধুসূদনের সেই প্রবণতার ফল তাঁহার ব্রজাঙ্গনা-কাব্য। অসামান্য প্রতিভাগুণে বীররস-প্রধান কবিতার ন্যায় গীতিকবিতাতেও যদি তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার স্বভাবতঃ বীরত্বানুরাগী হৃদয় তাঁহার অজ্ঞাতসারে পুনর্ব্বার বীররসেরই দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। ললিতপদাবলী সৃজন করিয়া তিনি বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধিকার মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু মেঘনাদবধের যে গম্ভীর ভেরী-নিনাদ একবার তাঁহার লেখনী হইতে উদ্গত হইয়াছিল, ব্রজাঙ্গনার মৃদুমধুর বংশীধ্বনিতে তাহা নিমগ্ন হয় নাই। গোপবালাগণের রোদন-নিনাদের মধ্যে যমুনার

কলকল শব্দের অভ্যন্তরে এবং বৃন্দাবনের তমালরাজির মর্ম্মর-ধ্বনিতে কখনও তাহা তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে বিরত ছিল না। তাঁহার প্রতিভা মেঘনাদবধের গাম্ভীর্য্য এবং ব্রজাঙ্গনার মাধুর্য্য একাধারে সম্মিলিত করিতে প্রস্তুত হইল; ইহার ফল বীরাঙ্গনা-কাব্য বীরাঙ্গনায় সেই জন্য একদিকে বনবাসিনী ঋষি-বালিকা শকুন্তলার করুণ মর্ম্মবেদনা এবং অপরদিকে বীর-প্রসূতি তেজস্বিনী জনার হৃদয়ভেদী তিরস্কার সম্মিলিত হইয়াছে। বীরাঙ্গনা, মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের সংযোগসূত্র-স্বরূপ এবং মধুসূদনের প্রতিভার গম্ভীর ও কোমল অংশের সম্মিলন-স্থল।

বীরাঙ্গনার আদর্শ

সুপ্রসিদ্ধ রোমক-কবি ওভিদের (Ovid) বীরপত্রাবলীর (Heroic Epistles) আদর্শে মধুসূদন তাঁহার বীরাঙ্গনা-কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। বীর-পত্রাবলীর ন্যায় বীরাঙ্গনা-কাব্যও প্রসিদ্ধা পৌরাণিক মহিলাগণের পত্রচ্ছলে গঠিত। যে সমস্ত দোষগুণ ওভিদের পত্রাবলীর বিশেষ লক্ষণ, বীরাঙ্গনাতেও তাহা লক্ষিত হয়। উভয় গ্রন্থেই প্রেমিক-হৃদয়ের রহস্য পরিজ্ঞানে অসামান্য নৈপুণ্য, উভয় গ্রন্থেই উদ্দাম কল্পনা এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্মনীতির ও সমাজনীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু বীরপত্রাবলীর সহিত বীরাঙ্গনার এইরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়া তাহাতে মৌলিকতার অভাব নাই। পত্রাকারে কাব্য-রচনা যে সম্ভবপর, মধুসূদন তাহাই কেবল ওভিদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন; কোনও স্থলে তাঁহার গ্রন্থের ভাবাপহরণ করেন নাই।

কাব্য-বিভাগ

বীরাঙ্গনা-কাব্য—দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা, অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা,

শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী এবং নীলধ্বজের প্রতি জনা—এই একাদশ সর্গে বিভক্ত। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইহা রচিত এবং পর বৎসরের প্রারম্ভে ইহা প্রকাশিত হয়। যাঁহার নিকট মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত মধুস্দন আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, "বঙ্গকুল-চূড়া" সেই মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "চিরস্মরণীয় নামে" ইহা উৎসৃষ্ট হইয়াছে।

বীরাঙ্গনার ভাষা

ভাষার লালিত্যে বীরাঙ্গনা মধুস্দনের অমিত্রচ্ছন্দে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যাঁহাদিগের বিশ্বাস অমিত্র-চ্ছন্দ গম্ভীর রচনার এবং বীররসের পক্ষে উপযোগী হইলেও, মধুর কোমল ভাবের উপযুক্ত নয়, বীরাঙ্গনার ভাষা তাঁহাদিগের সে ভ্রম দূর করিবে। বীরাঙ্গনার ভাষা মধুর অথচ ওজস্বী, প্রাঞ্জল অথচ গম্ভীর, এবং কবির কল্পনা-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যেন উত্থান-পতনশীল। ইংরাজীভাষায় যিনি অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারা তাহার উৎকর্ষ-সাধন হয় নাই; তাঁহার পরবর্ত্তী কবিগণেরই দ্বারা হইয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন এবং তাহার উৎকর্ষ-সাধন, এই উভয় গৌরবই মধুস্দনের প্রাপ্য। বীরাঙ্গনা রচনার পর হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গের প্রতিভাবান্ লেখকগণ অমিত্রচ্ছন্দে কবিতা লিখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের ভাষা বীরাঙ্গনার ভাষা অপেক্ষা উন্নত হয় নাই। ইহা বহুদিন পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশাক্ষরী অমিত্রচ্ছন্দের ভাষার আদর্শস্বরূপ থাকিবে।

বীরাঙ্গনা-কাব্য মধুস্দনের প্রতিভা-বিকাশের উর্দ্ধতম সীমা-স্বরূপ; ইহার পর হইতে তাঁহার প্রতিভার অধোগতি আরব্ধ হইয়াছে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অনুরোধে মহাভারতীয় কোন ঘটনা এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অনুরোধে সিংহল-বিজয়-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া তিনি দুইখানি কাব্য রচনা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

দুইখানিরই প্রথম অংশ লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন খানিই সম্পূর্ণ হয় নাই। সুনিপুণ ভাস্করের খোদিত মূর্ত্তির ভগ্নাংশ হইতে যেমন শিল্পীর নৈপুণ্য অনুমান করা যাইতে পারে, এই সকল অসম্পূর্ণ কবিতাতেও আমরা তেমনিই মেঘনাদবধ-রচয়িতার হস্তচিহ্ন দর্শন করিতে পারি।* মধুসূদনের অনেকগুলি অসম্পূর্ণ কাব্যের ও কবিতার বিষয় আমরা উল্লেখ করিয়াছি। যেরূপ মানসিক অশান্তিতে মধুসূদনের অধিকাংশ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই না। তিনি যে এতগুলি গ্রন্থ ধীর ভাবে সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন, বরং ইহাতেই বিস্মিত হই। তাঁহার আত্ম-বিলাপ-কবিতা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি; তাঁহার স্মরণার্থ-লিপিরও দুইটি মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। তাহা হইতে পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন যে, যিনি মেঘনাদ-বধ রচনা করিয়া শত শত নরনারীর হৃদয় পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের দিন কিরূপ অতৃপ্তিতে অতিবাহিত হইত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর স্বাক্ষরিত স্মরণার্থ-লিপিতে বীরাঙ্গনা-কাব্য সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন;—

It is my intention, God willing, to finish this poem (বীরাঙ্গনাকাব্য) in XXI Books. But I must print the XI already finished. The proceeds of the sale of the 1st part must defray the expenses of printing the second. "Born an age too soon"—a time will come when these works of mine will fill the pockets of printers, book-sellers, painters *et hoc genus omne* and now I am obliged to "shall out".

বীরাঙ্গনা কাব্যের জনা-পত্রিকা শেষ করিয়া তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন।—

* মধুসূদনের বিস্তৃত জীবন-চরিতে এই সকল কবিতা প্রদত্ত হইয়াছে।

The epistle of poor জনা must be revised and printed along with the Second set. I am very unpoetical just now. God knows in what all this trouble, anxiety, and vexation will end.

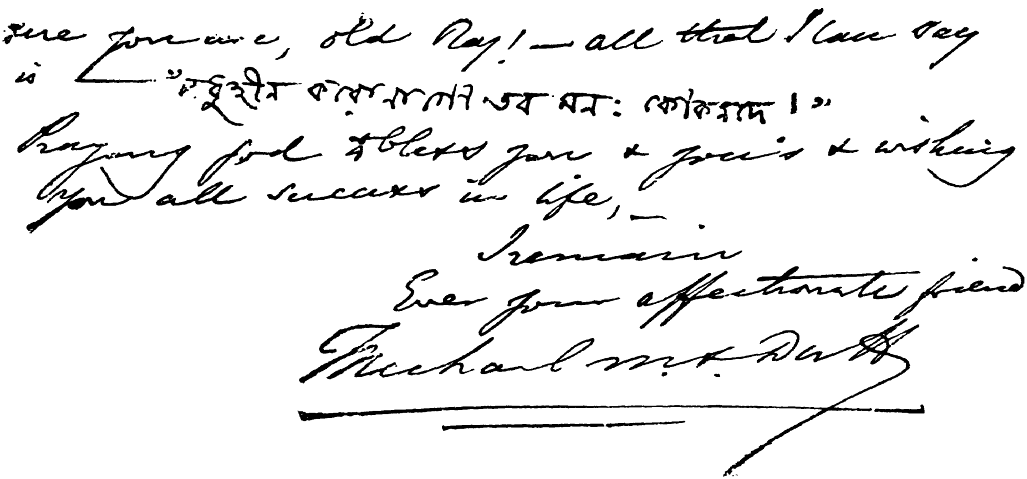
সাংসারিক কথা

যে সকল কারণে মধুসূদনের জীবনে শান্তি ছিল না, অর্থাভাবই তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। পুলিশ-আদালতের কার্য্য, পৈতৃক সম্পত্তি এবং পুস্তক-বিক্রয় হইতে তাঁহার যে আয় হইত, তাহাতে তাঁহার ক্লেশ ছিল না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় তাহাতে স্বচ্ছন্দে তাঁহার দিনপাত হইতে পারিত। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিনের জন্য হিন্দু পেট্রিয়ট-পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার কিছু কিছু অর্থাগম হইত। কিন্তু হইলে কি হইবে? ব্যয়-সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃতি যেরূপ ছিল, তাহাতে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও তাঁহার অর্থাভাব-ক্লেশ দূর হইত কি না সন্দেহ। তাঁহার মনে হইত, অর্থকৃচ্ছ্র দূর করিতে পারিলেই তিনি সুখী হইতে এবং অবাধে সাহিত্যের সেবা করিতে পারিবেন। ইংলণ্ড-গমনের জন্য বাল্য হইতেই তাঁহার বাসনা ছিল। ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতে পারিতে তাঁহার অর্থাভাব-ক্লেশ দূরীভূত হইবে তাঁহার এইরূপ ধারণা জন্মিল। তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে যে ভূ-সম্পত্তি রাখিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃব্যপুত্রগণের সঙ্গে মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া তিনি এক্ষণে তাহার অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই সম্পত্তি পত্তনি দিয়া তিনি ইংলণ্ড গমনের সঙ্কল্প করিলেন। এইরূপ স্থির হইল যে, পত্তনিদার মধুসূদনকে তাঁহার ইংলণ্ড গমনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কিয়ৎ-পরিমাণ অর্থ অগ্রিম দিবেন, এবং তাঁহার পত্নী-পুত্রাদির ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মাসিক দেড়শত করিয়া টাকা দিবেন। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে মধুসূদনকে পরে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। বৈষয়িক এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন, মধুসূদন ক্যাণ্ডিয়া নামক জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। বঙ্গ-সাহিত্য সেইদিন হইতে একটি প্রতিভাবান্ সন্তানের পূজায় বঞ্চিত হইলেন। ইংলণ্ড-গমনের পূর্ব্বে তিনি যে কবিতায় বঙ্গভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

ইংলণ্ড যাত্রা

রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মন-কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি মা ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে!
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে।
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে,
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে।


Sure you are, old Ray! — all that I can say
is — "মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।"
Praying God to bless you & yours & wishing
you all success in life, —
I remain
Ever your affectionate friend
Michael M. S. Dutt

মধুসূদনের হস্তলিপির প্রতিরূপ

# দশম অধ্যায়

## য়ুরোপ-প্রবাস—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

[ ১৮৬২-৬৬ খৃষ্টাব্দ ]

অষ্টাদশবর্ষ বয়স হইতে মধুসূদন যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, এতদিন পরে তাহা পূর্ণ হইল। শস্য-শ্যামলা জন্মভূমি, বর্ষাগমপ্রফুল্লা ভাগীরথী এবং প্রথম জীবনের ক্রীড়া-নিকেতন "প্রাসাদনগরী" কলিকাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মধুসূদন অর্ণবপোতে আরোহণ করিলেন। সেক্সপীয়ার, মিল্টনের জন্মভূমি, হোমর, ভার্জ্জিল, দান্তের লীলাক্ষেত্র, য়ুরোপ-ভূমি দর্শনের জন্য তিনি চলিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের ভাব বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। দেখিতে দেখিতে সেণ্টপল ধর্ম্ম-মন্দিরের উচ্চ শৃঙ্গ নিমগ্ন হইয়া গেল, গঙ্গাকূলবর্ত্তী নারিকেল বৃক্ষরাজি অদৃশ্য হইয়া আসিল এবং গঙ্গার বর্ষাজল সংস্পর্শে ঈষদারক্ত বারির পরিবর্ত্তে সুনীল সাগরাম্বু ক্রমেই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মধুসূদন মহাসমুদ্রে উপস্থিত হইলেন। মহাসমুদ্র তাঁহার নিকট অপরিচিত ছিল না; মান্দ্রাজে অবস্থানকালে তাহার গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া এবং তাহার বিশাল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি পুলকিত হইয়াছিলেন। আবার যে কখনও তিনি তাহার গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন, তাঁহার সে আশা ছিল না; কিন্তু বিধাতার বিধানে তাঁহার আশা পূর্ণ হইয়াছিল।

ইংলণ্ড-গমন

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষভাগে মধুসূদন ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন, এবং (Gray's Inn) গ্রেস্ ইন্ নামক প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার সমাজে

প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ব্যারিষ্টারী শিক্ষাকালের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান অনাবশ্যক। তিনি যে ব্যবসায় শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উপযুক্ত ছিল না। আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে, কেবলমাত্র সাংসারিক ইষ্টসিদ্ধির জন্য যদি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার যেরূপ পরিণাম হইয়া থাকে মধুসূদনের ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের পরিণামও সেইরূপ হইয়াছিল। কি পরীক্ষাস্থলে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, কোথাও তিনি ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর অধ্যয়নের পর, কোনও রূপে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনও সম্মান বা প্রতিপত্তি তাঁহার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই।

ইংলণ্ডে উপস্থিতি ও গ্রেস্ ইন্ ব্যারিষ্টার সমাজে প্রবেশ

আমরা বলিয়াছি যে মধুসূদনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থের ন্যায় তাঁহার নিজের জীবনও এক বিষাদান্ত কাব্য। কি জন্মভূমি বঙ্গদেশে, কি মান্দ্রাজে, কি য়ুরোপে, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি তাঁহার ভাগ্যে কোন স্থানেই ঘটে নাই। তাঁহার য়ুরোপ-প্রবাসকালে আমরা তাঁহার এই বিষাদময় জীবন-কাব্যের এক সুদীর্ঘ অধ্যায় দেখিতে পাই। যেরূপ দুর্দ্দশায় তাঁহার প্রবাসকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহার স্বদেশীয়গণের মধ্যে অতি অল্পলোকই তাহা অবগত আছেন। "দয়ার সাগর" বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সাহায্য না করিলে মধুসূদন কখনই ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন না। হয়ত অর্থাভাবে বিদেশের কোন কারাগারে বা দরিদ্রনিবাসে তাঁহার জীবন শেষ হইত। নিজের অবস্থা না বুঝিয়া সহসা একটি ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া যে মধুসূদনের সেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল তাহা নয়। মনুষ্যপ্রকৃতি

য়ুরোপ-প্রবাসকালীন দুরবস্থা

না বুঝিয়া তিনি যে অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারই ফলে তাঁহাকে সেরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছিল। যে অবস্থায় তিনি য়ুরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যাঁহাদিগের উপর তিনি নিজের বৈষয়িক কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার স্বদেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা আপন আপন কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলেন। নির্দ্দিষ্ট মাসিক অর্থ-সাহায্যে বঞ্চিত হওয়াতে মধুসূদনের এবং তাঁহার পত্নীর বিপদের সীমা রহিল না। স্বামীর অসাক্ষাতে কোনরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব দেখিয়া মধুসূদনের পত্নী স্বামীর নিকট গমনই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং মধুসূদনের স্বদেশত্যাগের এক বৎসরের মধ্যে আপনার শিশু দুইটিকে লইয়া য়ুরোপে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ এইরূপ ব্যয়বৃদ্ধিতে মধুসূদন বিষম বিপদে পড়িলেন। সপরিবারে য়ুরোপে বাস সহজ নয়; তাহার উপর মধুসূদন আবার পরিমিতব্যয়ী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার সঞ্চিত অর্থ অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া আসিল এবং প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অলঙ্কার, বস্ত্র, গৃহসামগ্রী ইত্যাদি সমস্তই ক্রমে গবর্ণমেণ্ট-বন্ধক-আফিসে আবদ্ধ হইল। অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তনের জন্য বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মধুসূদনকে যে সুন্দর রৌপ্য পান-পাত্র উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তিনি তাহাও পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে বাধ্য হইলেন। ফরাসী ভাষাশিক্ষার সুবিধার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে সংসারনির্ব্বাহ হইবে বলিয়া এবং তাঁহার পত্নীর স্বাস্থ্যের জন্য মধুসূদন ফ্রান্সের অন্তর্গত ভার্শেল্‌স্‌ নগরে আসিয়াছিলেন; অর্থাভাবে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই। ভার্শেল্‌সে অবস্থানকালে তাঁহার দুর্দ্দশা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। সেখানে কোন কোন দিন সত্যই তাঁহাকে অনশনে দিনপাত করিতে হইত। ঋণের জন্য পাছে তাঁহাকে কারাগারে যাইতে হয়, এই আশঙ্কায় মধুসূদন

সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। একটি দয়াবতী ফরাসী মহিলা তাঁহার দুরবস্থা অবগত হইয়া এই সময় তাঁহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্তবংশীয় দরিদ্র ব্যক্তিগণ মর্য্যাদাভঙ্গের ভয়ে পাছে প্রকাশ্য সাহায্য-গ্রহণ না করেন এই জন্য কোন কোন ফরাসী দাতব্য-সমিতি অতি সঙ্গোপনে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। মধুসূদনের দুর্দ্দশার বিষয় জ্ঞাত হইয়া এইরূপ একটি দাতব্য-সমিতি তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার গৃহের দ্বারে আহার্য্য সামগ্রী ও শিশুদের জন্য দুগ্ধ রাখিয়া যাইতেন, তাহাতে কোনরূপে দিনপাত হইত। কিন্তু এরূপ অবস্থায় কত দিন চলিতে পারে? যাঁহাদিগের কথার ও প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি য়ুরোপে গমন করিয়াছিলেন, এ সময় অর্থপ্রেরণ দূরে থাকুক, বারম্বার পত্র লিখিলেও তাঁহারা প্রত্যুত্তর দিতেন না। মধুসূদন উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই অশরণের শরণ, "দয়ার-সাগর" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। মধুসূদনের য়ুরোপ-গমন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আপনার দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া মধুসূদন এক্ষণে তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন। যে হৃদয় কোনদিন শরণাগতের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই, মধুসূদনের দুঃখে যে তাহা উদাসীন থাকিবে তাহা কখনও সম্ভবপর নয়। মধুসূদনের পত্র পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ত্বের ও সহৃদয়তার উপযুক্ত কার্য্য করিলেন। তাঁহার নিজের নিকট সে সময় মধুসূদনের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ ছিল না; তিনি ঋণ করিয়া মধুসূদনকে পনর শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পর আরও কয়েক বার তিনি মধুসূদনকে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদত্ত ঋণের কিয়দংশ মাত্র পরিশোধ করিতে পারিয়াছিলেন; অবশিষ্ট তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অপরিশোধিত ছিল।

মধুসূদন প্রধানতঃ ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন ; কিন্তু য়ুরোপীয় ভাষা সমূহে অধিকার লাভও তাঁহার য়ুরোপ-গমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইংলণ্ডে আগমন করিয়া তিনি তাঁহার এই বাসনা চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। য়ুরোপ হইতে তিনি তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ গৌরদাসবাবুকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সকল পত্রে তিনি তাঁহার ভাষাশিক্ষার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সকল ভাষার সাহায্যে স্বদেশীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন করিবার জন্য তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। তিনি গৌরদাসবাবুকে লিখিয়াছিলেন যে এক একটি য়ুরোপীয় ভাষার অধিকার-লাভ আর একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকার-লাভ সমান। আইন-অধ্যয়নের অনুরোধে যদিও তিনি অধিক সময় কবিতা-রচনায় ব্যয় করিতে পারিতেন না, তথাপি স্বাভাবিক প্রবণতা বশতঃ তাহা হইতে একেবারে নিরস্ত থাকিতে সক্ষম হইতেন না। ইংরাজী, ফরাসী এবং ইতালীয় প্রভৃতি ভাষায় কবিতা-রচনা করিয়া তিনি অবকাশ কাল বিনোদন করিতেন। ফরাসী অথবা ইতালীয় ভাষায় প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রন্থ রচনা করিব বলিয়া তিনি কখনও সঙ্কল্প করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, কোনও ভাষায় কবিতা-রচনার ক্ষমতা না জন্মিলে তাহাতে প্রকৃত অধিকার জন্মিয়াছে, একথা বলা যায় না। সেই জন্য তিনি নিজের ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষার্থ এই দুই ভাষায় কবিতা-রচনার অভ্যাস করিতেন ; কিন্তু ইংরাজী-ভাষায় কবিতা-রচনা সম্বন্ধে তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া ইংরাজ-কবিগণের সমকক্ষ হইব, বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার এই বাল্যসংস্কার অন্তর্হিত হইলেও, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে ভারতীয় কাব্য হইতে দুই একটি রত্ন সংগ্রহ পূর্ব্বক উপহার প্রদান করিবার জন্য তাঁহার এক নূতন বাসনা জন্মিয়াছিল।

ভাষাশিক্ষা

এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতীয় কাব্যসমূহের গৌরবস্বরূপ সীতাচরিত্র অবলম্বনে ইংরাজী ভাষায় একখানি কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সীতার বনবাস-বৃত্তান্ত হইতে তাঁহার কাব্য আরব্ধ হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দুই তিন শত পংক্তি লিখিয়াই তিনি ইহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সীতাকাব্য

'সীতা' কাব্য ভিন্ন কতকগুলি ইংরাজী খণ্ডকবিতাও তিনি য়ুরোপ প্রবাস কালে রচনা করিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালা ভাষাতেও সুভদ্রাহরণ ও দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর নামক দুইখানি নূতন কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কোন খানিই তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। মানসিক অশান্তির জন্য 'সুভদ্রাহরণ' কাব্য সম্পূর্ণ করিতে না পারিয়া তিনি চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলীতে বিষাদে লিখিয়াছিলেন;—

সুভদ্রাহরণ কাব্য

"তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে;—
নবতানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রা-সুন্দরী!
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে! আশার লহরী—
শুকাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে।
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবান-তর কবি পূজি দ্বৈপায়নে,
ঋষিকুল-রত্ন দ্বিজ, গাবে লো ভারতে
তোমার হরণগীত, তুষি বিজ্ঞ জনে
লভিবে সুযশ সাঙ্গি এ সঙ্গীত-ব্রতে।"

মধুসূদনের ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইয়াছে; মহর্ষি দ্বৈপায়নের পূজার ফলে কবিবর নবীনচন্দ্র যে অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর করিবে।

তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যের একটি নূতন সংস্করণ করিবার এবং বীরাঙ্গনা

কাব্যের অসম্পূর্ণ পত্রিকাগুলি সম্পূর্ণ করিবার জন্যও মধুসূদন য়ুরোপে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। মধুসূদনকে যে অবস্থায় য়ুরোপে বাস করিতে হইয়াছিল, আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সে অবস্থায় মনের ভাব ধারাবাহিকরূপে গ্রথিত করিয়া কাব্য রচনা করা সম্ভবপর নয়। সাময়িক উচ্ছ্বাসে তিনি এক একটি নূতন বিষয় আরম্ভ করিতেন, কিন্তু তাহার পর দৃঢ়তার ও সহিষ্ণুতার অভাবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া, আবার একটি নূতন বিষয় আরম্ভ করিতে বাধ্য হইতেন। এই জন্য একমাত্র চতুর্দ্দশপদী কবিতা-

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

বলী ভিন্ন তাঁহার য়ুরোপে আরব্ধ গ্রন্থসমূহের কোনখানিই সম্পূর্ণ হয় নাই। কবিতাবলীও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কবিতায় গ্রথিত না হইলে সম্পূর্ণ হইত কি না সন্দেহ। ফ্রান্সের অন্তর্গত ভার্শেল্‌স্ নগরে অবস্থান কালে ইতালীয় কবি পেতরার্কার অনুকরণে মধুসূদন ইহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অমিত্রচ্ছন্দের ন্যায় চতুর্দ্দশপদী-কবিতাও তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালাভাষায় প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। "চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলী" নানাবিষয়িণী চুরানব্বইটি কবিতায় সংগঠিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গুণিগণের প্রতি সমাদর, ভারতীয় কাব্য ও পুরাণোক্ত ঘটনা এবং মধুসূদনের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি নানাবিষয় অবলম্বনে রচিত কবিতা ইহাতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। জননী "ভারত-ভূমি" হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশীয় "কেউটিয়া সাপ" এবং "বউকথা-পাখী" পর্য্যন্ত কবি ইহার বিষয়ীভূত করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলী সৌন্দর্য্যে মধুসূদনের অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও একটি কারণে বিশেষ আলোচনার যোগ্য। মধুসূদনের কবিশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে যেমন তাঁহার মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা পাঠ করা আবশ্যক, মধুসূদনকে জানিতে হইলে তেমনই

তাঁহার চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলী পাঠ করিবার প্রয়োজন। সেইজন্য আমরা চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলীর একটু বিস্তৃত সমালোচনা করিব। ইহার অনেক কবিতায় তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়াছে এবং অনেকগুলিতে তিনি তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় দৃষ্ট হইবে। তাহার পর প্রথম বয়সে বাঙ্গালা-ভাষা সম্বন্ধে মধুসূদনের কিরূপ বিরাগ ছিল এবং "বঙ্গ-কুললক্ষ্মী"র আদেশে তিনি কিরূপে মাতৃভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। শৈশবে যাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তিনি আহার, নিদ্রা বিস্মৃত হইতেন এবং যাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে তিনি ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহার পর তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার সম্মাননা দৃষ্ট হইবে। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র এবং তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রত্যেকেরই প্রতি মধুসূদন উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশীয় এই সকল কবির সঙ্গে তাঁহার সমকালবর্ত্তী ফরাসী-কবি ভিক্‌তর হিউগো এবং ইংলণ্ডীয় রাজকবি আলফ্রেড টেনিসনের প্রতি তিনি সম্মান-প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। কবিগুরু বাল্মীকি, মধুরভাষী জয়দেব, কবিকুলতিলক কালিদাস, পণ্ডিতবর গোল্ডষ্টুকর এবং ইতালীয় কবি দান্তের সম্বন্ধেও এক একটি কবিতা রচিত হইয়াছে। মধুসূদন যখন ফ্রান্সে অবস্থান করেন, সেই সময় দান্তের মৃত্যুর ত্রিশত-বাৎসরিক মহোৎসব সম্পন্ন হয়। য়ুরোপীয় অনেক কবি তদুপলক্ষে কবিতা-উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনও এই উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করিয়া তাহা ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক ইতালীরাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইতালীরাজ ভিক্টর ইমানিউয়েল তাহা পাঠ করিয়া প্রীতি প্রকাশ

পূর্ব্বক মধুসূদনকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, "আপনার কবিতা গ্রন্থিরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিবে।" (It will be a ring which will connect the orient with the occident)। * এই সকল কবিতার সঙ্গে ভারতীয় কাব্য ও পুরাণোক্ত ঘটনা অবলম্বনেও অনেক কবিতা রচিত হইয়াছে। কবি-কঙ্কণের "কমলে-কামিনী" ও "শ্রীমন্তের টোপর", ভারতচন্দ্রের "অন্নপূর্ণার ঝাঁপি", রামায়ণের "সীতার বনবাস", মহাভারতের "গদাযুদ্ধ" ও "সুভদ্রাহরণ" প্রভৃতি অনেক বিষয় চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রবাসে স্বদেশের স্মৃতি বড়ই মধুর ; প্রত্যেক সামগ্রীই যেন একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য মনোমুগ্ধকর ফরাসীভূমিতে থাকিয়াও মধুসূদনের হৃদয় তাঁহার বাল্যের প্রিয়নদী কপোতাক্ষী, স্বদেশের নীলাকাশস্থিত তারকা, জ্যোৎস্নাধৌত-রজনী, নক্ষত্রমণ্ডিত ছায়াপথ এবং নদীকূলস্থিত শিব-মন্দির স্মরণ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইত। তিনি কবিতায় হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন ; কিন্তু এই সকল কবিতার অপেক্ষা যে গুলিতে তিনি তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুলিই অধিক চিত্তাকর্ষক। মধুসূদনকে চিনিতে হইলে সেইগুলি পাঠ করা বিশেষ প্রয়োজন। মধুসূদন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও হিন্দুভাব তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ রাজত্ব করিত, এবং বৈদেশিক আচার, ব্যবহারের অনুকরণ করিলেও স্বদেশানুরাগ তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ গভীর ছিল, চতুর্দ্দশপদীর অনেক কবিতায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলীর সঙ্গেই মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন প্রকৃত প্রস্তাবে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পর তিনি আর যাহা রচনা

* দুর্ভাগ্যক্রমে মূল পত্রখানি পাওয়া যায় নাই। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয় স্মরণ করিয়া গ্রন্থকারকে তাহা হইতে এই পংক্তিটি বলিয়াছিলেন।

করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না করিলেও ক্ষতি নাই। য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার সময়ে, সেই সকল ভাষার সাহায্যে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিমতী করিবার জন্য তাঁহার যে বাসনা জন্মিয়াছিল, তাহা হৃদয়ে উত্থিত হইয়াই হৃদয়ে বিলীন হইয়াছিল। নিজের পরিণাম বুঝিতে পারিয়া চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলীতে তিনি বঙ্গভাষার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"বিসর্জ্জিব আজি, মাগো, বিস্মৃতির জলে
হৃদয়-মণ্ডপ, হায়! অন্ধকার করি
ও প্রতিমা। নিবাইল, দেখ, হোমানলে,
মনঃকুণ্ডে, অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি।
শুকাইল দুরদৃষ্ট, সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মন, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম। ডুবিল সে তরি,
কাব্যনদে খেলাইনু যাহে পদতলে
অল্পদিন! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে
যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?
এবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষবারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।"

মধুসূদনের য়ুরোপ-প্রবাসকাল এইরূপে সমাপ্ত হইল। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রবাসকাল-সমাপ্তি

তাঁহার এই সময়কার লিখিত একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব। মধুসূদনের য়ুরোপ-প্রবাসকালে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের পিতা পরলোক-

গমন করেন। মধুসূদনের পিতার সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ্য ছিল। মধুসূদন মনোমোহনবাবুর জননীকে সান্ত্বনাদানের জন্য এই পত্র লিখিয়াছিলেন। পাঠক ইহাতে একদিকে মধুসূদনের স্বভাব-কোমল স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের এবং অপরদিকে তাঁহার অলঙ্কার-বিন্যাসের ও শব্দাড়ম্বর-প্রিয়তার নিদর্শন প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া আমরা ইহা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা-রচনার পরেও মধুসূদনকে এরূপ ভাষায় পত্র লিখিতে দেখিয়া আমাদিগের মনে হয় যে, তিনি রাজনারায়ণবাবুকে তাঁহার বাঙ্গালাভাষায় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা অপ্রকৃত নয়।* বাস্তবিকই ভাব ও কল্পনা শব্দ সংগ্রহ করিয়া আনিত, তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া শব্দসংগ্রহ করিতে হইত না।

## শ্রীচরণকমলেষু—

জেঠা মহাশয়ের স্বর্গ-প্রাপ্তি-সংবাদে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য। সংবাদ পাইবামাত্রই আমার স্ত্রী ও আমি প্রিয়বর মনোমোহনের বাসায় যাইয়া তাঁহাকে এ বাটীতে আনিয়া সাধ্যানুসারে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টায় আছি; আপনি তন্নিমিত্তে উৎকণ্ঠিতা হইবেন না। আপনি পরম জ্ঞানবতী, সুতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিদিত নহে যে, এরূপ তীক্ষ্ণ শর-স্বরূপ শোক এ সংসারে সর্ব্বদাই মানবকুলের হৃদয় বিদ্ধন করে। পিতৃ-চরণ-দর্শন-সুখ প্রিয়বর যে আর পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণমান। এ দাসেরও আশা-লতা ছিন্ন হইল। ভাবিয়াছিলাম যে, কৃতকার্য্য হইয়া দুই ভাই একত্রে দেশে ফিরিয়া যাইব এবং

I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves—words that never I thought I knew. Here is a mystery.

আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত নির্ব্বাণস্নেহাগ্নি পুনর্ব্বার পদ-সেবা করিয়া প্রজ্বলিত করিব; কিন্তু এ আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। এক্ষণে আপনি স্মরণপথে রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে চরিতার্থ হইব। প্রিয়বর তারপথে কলিকাতায় যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা বোধ করি পাইয়া থাকিবেন। তিনি এদেশ হইতে অতি ত্বরায় ফিরিয়া যাইবার চেষ্টায় আছেন। যতদিন এখানে থাকেন, তাঁহার মনের বেদনা লঘুতর করিতে কোন মতেই অমনোযোগী হইব না। নিবেদনমিতি।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী

দাস মধুসূদন দত্তস্য।

# একাদশ অধ্যায়

## শেষ জীবন—ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়

## হেক্টরবধ ও মায়াকানন

[ ১৮৬৭-৭৩ খৃষ্টাব্দ ]

পাঁচ বৎসরকাল প্রবাসের পর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মধুস্থদন য়ুরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। মান্দ্রাজ-প্রবাসকালের ন্যায় এবারও তিনি দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া-ছিলেন; কিন্তু এবার তাঁহার অবস্থা কতই বিভিন্ন! মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে পিতামাতার মৃত্যুতে এবং আত্মীয়-বন্ধুগণের ব্যবহারে তিনি আপনাকে প্রকৃতই অনাথ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যয় থাকিলেও, তখন তাঁহার আশা প্রগাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। বঙ্গীয় সমাজের নিকট তখন তিনি একরূপ মৃত ছিলেন বলিলেও হয়; দুই একজন সহৃদয় সুহৃদ্ ভিন্ন কেহ তখন তাঁহার সংবাদ রাখিতেন না। কিন্তু বিধাতার অনুকূলতায় এখন তাঁহার জীবনের এক নূতন দিন আরব্ধ হইয়াছিল। এখন, তিনি মেঘনাদবধ-কাব্যের কবি, ছয়টি য়ুরোপীয় ভাষায় অভিজ্ঞ এবং ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের ব্যারিষ্টার। বিদ্যা, বুদ্ধি এবং পদমর্য্যাদা এখন তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশের গৌরবস্থল করিয়াছিল। তাঁহার প্রবাসকালের মধ্যে তাঁহার কাব্যসমূহের যশঃসৌরভ সমস্ত বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কত হৃদয় তাঁহার অগোচরে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত, তাঁহার

য়ুরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন

কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিত এবং উৎসুকভাবে তাঁহার স্বদেশ-প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিত। স্বদেশের এবং স্বজাতীয়গণের গৌরবস্থল ও কল্যাণভাজন হইয়া তিনি এইরূপে জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যে মহাত্মা তাঁহার প্রবাসকালে সাহায্য করিয়া, তাঁহাকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখনও তাঁহার দয়ার বিরাম ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় মধুসূদনের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এবং অন্যান্য বন্ধুগণের সাহায্যে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া তিনি কলিকাতার হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন।

ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে মধুসূদন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। তিনি ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে বাঙ্গালা সাহিত্য নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত ব্যবসায় বিন্দুমাত্রও লাভবান্ হয় নাই। ব্যবহারশাস্ত্রকে উন্নত করা দূরে থাকুক, তিনি নিজের সাংসারিক অবস্থারও উন্নতি করিতে পারেন নাই। তাঁহার সমকালীন দেশীয় ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধিতে তিনি সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন, কিন্তু আইন ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে বিদ্যা, বুদ্ধির সঙ্গে অন্য যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহার ছিল না। তিনি কবি—কবির ন্যায় কল্পনা-নেত্রে জগৎ দর্শন করিতেন। ভাবের তরঙ্গে তাঁহার নিকট যুক্তি ও প্রমাণ নিমগ্ন হইয়া যাইত। ব্যবহার-শাস্ত্রের কূটতর্ক তাঁহার স্বভাব-সরল কবি-প্রকৃতির উপযুক্ত ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দু-পেট্রিয়ট-পত্রিকা যথার্থ লিখিয়াছিলেন যে, nursed on the lap of poetry he was not the man to suck the moisture of life from the dry bones of law,

অনেক বিষয়ে তাঁহার প্রকৃতি বাস্তবিকই এরূপ ছিল যে, তাহা ব্যবহারাজীবের উপযুক্ত নয়। বিচারকদিগের সন্তুষ্টিসাধন করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার কৌশল তিনি একেবারেই অবগত ছিলেন না। হাইকোর্টের তৎকাল-প্রসিদ্ধ বিচারক সার লুই জ্যাক্‌সনের সহিত তাঁহার প্রায়ই বাদানুবাদ হইত। বিকৃত কণ্ঠস্বরও তাঁহার অকৃতকার্য্যতার একটি প্রধান কারণ ছিল; বিচারকগণ তাঁহার বক্তৃতায় প্রীতিলাভ করিতেন না। এই সকল কারণে মধুসূদন ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি যে একেবারেই অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা নয়; তবে তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ ব্যক্তির নিকট যাহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, তাহা হয় নাই বলিয়াই আমরা তাঁহার ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্যতার কথা বলিতেছি। প্রথম প্রথম তাঁহার ব্যবসায়ে বিলক্ষণ আশার চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল। সুপণ্ডিত ও সুলেখক বলিয়া তাঁহার নাম পূর্ব্ব হইতেই সকলের পরিচিত ছিল। সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য দেশীয় ব্যারিষ্টারদিগের অপেক্ষা অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার ব্যবসায়ের সুবিধা হইয়াছিল, এবং এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার আয় মাসিক এক হাজার হইতে দেড় হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল; কিন্তু ইহার পর আর বড় উন্নতি হয় নাই; বরং তাঁহার প্রথমার্জ্জিত প্রতিপত্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল, এবং শেষে উপায়ান্তরের অভাবে তিনি প্রিভি-কাউন্সিলের অন্যতম অনুবাদকের কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "চঞ্চল ধনদার" প্রসাদলাভের জন্য তিনি জননী বাগ্দেবীর আরাধনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সপত্নীর সেবা করিতে দেখিয়া বাগ্দেবী তাঁহার হৃদয়মন্দির হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন; কিন্তু কমলাও তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন না। মধুসূদন রত্নলাভের আশায় রত্নাকরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু রত্ন প্রাপ্ত হইলেন না; তাঁহার মুখ কেবলই ক্ষারবারিতে পূর্ণ হইল।

সাহিত্য-সেবা

য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর মধুসূদন ছয় বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। এই ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টাতেই তাঁহার দিন গত হইত; বাগ্দেবীর সেবার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তবে তাঁহার ন্যায় আজন্ম-কবির পক্ষে সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে একেবারে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না; সেই জন্য মধ্যে মধ্যে সাহিত্যের সেবা না করিয়া তিনি নিরস্ত থাকিতে পারিতেন না। য়ুরোপ-প্রবাস কালের ন্যায়, এখনও তিনি দুই একটি নূতন বিষয় অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই সকল অসম্পূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে তিনখানির কথা উল্লেখ-যোগ্য। প্রথম নীতিমূলক কবিতামালা, দ্বিতীয় হেক্টরবধ, তৃতীয় মায়াকানন। নীতিমূলক কবিতাগুলি "ঈশপ্‌স্-ফেবল্‌সের" (Aesop's Fables) আদর্শে বাঙ্গালা কথামালার প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল। নিজের অর্থাভাবক্লেশ দূর করিবার আশায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ হইবার জন্য মধুসূদন সম্ভবতঃ তাহা রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতার মধ্যে অনেকগুলি অতি সুন্দর। বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের কয়েকটি সাধারণের পরিচিত হইয়াছে।* তাঁহার মৃত্যুর পর সাধারণী পত্রিকাতে কয়েকটি প্রকাশিত হইয়াছিল; কয়েকটি এখনও অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

নীতিমূলক কবিতা

হেক্টর-বধ

নীতিমূলক কবিতাগুলি মধুসূদন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার হেক্টর-বধও এই বৎসর প্রকাশিত হয়। যাঁহার সহিত বাল্যাবধি

* রসাল ও স্বর্ণলতিকা, মেঘ ও চাতক, সূর্য্য ও মৈনাক ইত্যাদি।

মধুসূদন "প্রণয়-সূত্রে চিরগ্রথিত" ছিলেন, তাঁহার সেই শৈশব-সুহৃদ্ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে ইহা উৎসৃষ্ট হইয়াছে। হেক্টরবধ মধুসূদনের গ্রীকভাষার ও হোমরের প্রতি অনুরাগের ফল। ট্রয়-রাজ-কুমার মহাবীর হেক্টরের মৃত্যু ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। মধুসূদন ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইলিয়দের দ্বাদশ সর্গ পর্য্যন্ত বর্ণিত বিষয় লইয়াই তিনি তাঁহার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। গদ্যরচনা মধুসূদনের প্রতিভার উপযোগিনী ছিল না। যে অতিরিক্ত অলঙ্কার-বিন্যাস-প্রিয়তা তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্যগ্রন্থগুলিকেও স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্য ও কৃত্রিমতা-পূর্ণ করিয়াছে, গদ্যে তাহার আধিক্য হইতে তাহা কখনই পাঠকের প্রীতিকর হইতে পারে না। হেক্টর-বধের ভাষা ব্যাকরণদুষ্ট, গ্রাম্যতা-পূর্ণ এবং আদ্যোপান্ত পাশ্চাত্য-ভাবানুপ্রাণিত বলিয়া ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। "পাণ্ডুগণ্ডশঙ্কা", "পিত্তল-পদ", "কুঞ্চিত-কাঞ্চন-কেশর-মণ্ডিত অশ্ব", "ভূকম্পকারী জলদলপতি" এবং "পাতালকৃতবসতি দেবগণ" ইত্যাদি পদগুলি পাশ্চাত্যভাষাভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে কোনরূপে অর্থবোধক হইলেও সাধারণ পাঠকের বোধগম্য নহে। "রণিলে", "নিবেদিলে", "প্রদানিবেন" ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি পদ্যে বিশেষ আপত্তিজনক না হইলেও গদ্যে কখনই প্রয়োগযোগ্য নয়। তবে হেক্টর-বধের ভাষার এই একটি গুণ আছে যে, হোমরের ভাষার আদর্শে গঠিত বলিয়া ইহা তেজোময় ও উৎসাহোদ্দীপক ; দোষগুণ সমস্ত লইয়া হেক্টর-বধ সম্বন্ধে এ কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, মধুসূদন এই গ্রন্থ প্রকাশিত না করিলেই ভাল করিতেন। নীতিমূলক কবিতামালার ন্যায় এখানিও বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইলে তাঁহার অর্থাভাব-ক্লেশ দূরীভূত হইবে, এই প্রত্যাশাতেই বোধ হয় তিনি ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হেক্টর-বধের সঙ্গে মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন প্রায় শেষ হইয়া-

ছিল ; সুতরাং এইবার আমরা তাঁহার অন্তিমজীবনের বিষাদময় ইতিহাস বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর মধুসূদন ছয় বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন ; ইহার মধ্যে ন্যূনাধিক পাঁচ বৎসর তিনি হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করেন। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যারিষ্টারী দ্বারা তিনি যেরূপ আয়ের আশা করিয়াছিলেন, তাহা ঘটে নাই ; অথচ তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ব্যয়ের সঙ্কোচ ছিল না। ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রত্যাশায় এবং পদমর্য্যাদা ও সম্ভ্রমরক্ষার জন্য তিনি ঋণ করিয়া অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় করিতেন। মান্দ্রাজে ও য়ুরোপ-প্রবাসকালে অর্থাভাবে নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিয়াও তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। অনেক সময় তিনি নিতান্ত হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের ন্যায় অকারণে অথবা সামান্য কারণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। যে পৈতৃক সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি য়ুরোপ-প্রবাসকালের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ঋণ করিয়াছিলেন তাহা সমস্ত বিক্রয় করিয়াও তাঁহার ঋণ পরিশোধিত হয় নাই। সুতরাং ঋণভার স্কন্ধে লইয়াই তাঁহাকে প্রথম হইতে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এদিকে ব্যয়ের অনুরূপ আয় ছিল না। সুতরাং মধুসূদনের ঋণ এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অশান্তিও ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। কেবলই যে উচ্ছৃঙ্খলতায় অথবা বিলাসিতায় অর্থব্যয় হইত তাহা নয় ; অনেক সদনুষ্ঠানেও তিনি মুক্তহস্তে অর্থ-সাহায্য করিতেন। অর্থের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও মমতা ছিল না ; স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয় বলিতেন যে, কাহাকেও সাহায্য করিবার সময় মধুসূদন কখনও গণনা করিয়া টাকা দিতেন না। একমুষ্টিতে বা বিমুষ্টিতে যাহা উঠিত তাহা দিয়া প্রার্থীকে বিদায় করিতেন। এরূপ ব্যক্তির পরিমিত অর্থে সঙ্কুলন হওয়া সম্ভবপর নয়। যতক্ষণ কিছু সম্বল থাকিত, সৎকার্য্যেই হউক,

অন্তিমজীবনের কথা

আর অসৎ কার্য্যেই হউক, ধূলিমুষ্টির ন্যায় মধুসূদন ব্যয় করিতেন; তাহার পর অর্থাভাব হইলেই ঋণের জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেন, নিজের সংসারনির্ব্বাহের জন্য হয়ত তিনি কিছু ঋণ করিয়া আনিয়াছেন, সেই সময় কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় অথবা কোন দারিদ্র্য-পীড়িত পরিচিত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে দুঃখ জানাইলে নিজের দুরবস্থা সত্বেও মধুসূদন তাঁহাকে একেবারে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিতেন না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের জজ হইলে বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার ও উকীল মাত্রেই পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদন অপর সকলের ন্যায় কেবলই মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন নাই। সমব্যবসায়ীদিগকে ও বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সুবৃহৎ ভোজ দিয়াছিলেন। তাহাতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। এইরূপ কারণেও মধ্যে মধ্যে ব্যয় হইত। উদারতা ও দানশীলতা কখনও কখনও মাত্রাধিক হইয়া দাঁড়াইত। আমরা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একবার মধুসূদনের এক বাল্যসুহৃদ্ * তাঁহার কোন পরিচিত ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া মধুসূদনের নিকট একটি মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ জানিবার জন্য গিয়াছিলেন। মধুসূদন পরামর্শ দান করিলে ভদ্রলোকটি তাঁহাকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক দিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলেন না। ভদ্রলোকটি বিদায় লইলে মধুসূদন তাঁহার বাল্যসুহৃদ্‌কে বলিলেন—"ভাই! তুমি যখন উঁহাকে আত্মীয় বোধে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, তখন আমি কিছুতেই উঁহার নিকট হইতে পারিশ্রমিক লইতে পারি না; কিন্তু আমার গৃহে আজ একটি কপর্দ্দকও নাই; যদি তোমার নিজের টাকা সঙ্গে থাকে তবে পাঁচটি টাকা ঋণ দিয়া আমার

অর্থাভাব ও উদারতা

* পদ্মিনী-উপাখ্যান প্রণেতা স্বর্গীয় রঙ্গলালবাবুর কনিষ্ঠ বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্ত্রীকে বলিয়া আইস যেন উপযুক্ত সময়ে আমার আহার্য্য প্রস্তুত হয়।” একদিকে তাঁহার এইরূপ উদারতা দেখিয়া যেমন আমাদিগের আনন্দ হয়, অপরদিকে গৃহীত ঋণ পরিশোধের চেষ্টায় তাঁহার ঔদাসীন্যের বিষয় স্মরণ করিলে আমাদের ক্লেশ বোধ হয়। অর্থাভাব হইলেই তিনি ঋণ করিতেন, কিন্তু কোথা হইতে যে সে ঋণ পরিশোধ হইবে সে সম্বন্ধে তিনি একবারও চিন্তা করিতেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহার য়ুরোপ-প্রবাসকালে গৃহীত ঋণের কিয়দংশ অপরিশোধিত ছিল; তাহার উপর আরও নূতন নূতন ঋণ হইয়াছিল। শেষাবস্থায় তিনি ঋণভারে একেবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সামান্য দোকানদার ও দাসদাসী হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত নানা শ্রেণীর বহু ব্যক্তির নিকট ঋণ রাখিয়া তিনি পরলোকগমন করিয়াছিলেন। কাহাকেও বঞ্চনা করিব মধুসূদন কখন স্বপ্নেও সে কথা মনে করিতেন না; কিন্তু প্রবঞ্চক না হইলেও বিষয়বুদ্ধির ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অভাবে তাঁহার ব্যবহার সময়ে সময়ে প্রবঞ্চকেরই ন্যায় প্রতীয়মান হইত। ঋণ-বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বাল্যাবধি যে সকল কু-অভ্যাসে তিনি অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, বয়সের সঙ্গে তাহা সংশোধিত হয় নাই, বরং ক্রমশঃ দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল; এক্ষণে তাহার বিষময় ফল তিনি ভোগ করিতে লাগিলেন। মানসিক অবসাদ ও উদ্বেগ দূর করিবার জন্য তিনি হয় কবিতার না হয় মদিরার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এরূপ অবস্থায় রচিত কবিতা আর যে সেই পূর্ব্ব প্রতিভার অনুরূপ হইবে সে সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু তাহাতে কবিত্ব বা সৌন্দর্য্য না থাকুক তাহার দুই একটি স্থল কবির তাৎকালিক মানসিক অবস্থার সুস্পষ্ট সাক্ষ্যদান করে। ভগবতী বাগ্দেবীর ন্যায় কমলারও অনুগ্রহভাজন হইবেন, দুর্ভাগ্য কবির এই বড় আশা ছিল; কিন্তু অদৃষ্টের প্রতিকূলতায় তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না

দেখিয়া তিনি নিরাশ-হৃদয়ে কমলাকে সম্বোধনপূর্ব্বক লিখিয়াছিলেন—

"ভেবেছিনু মোর ভাগ্যে, হে রমাসুন্দরী !
নিবাইবে সে রোষাগ্নি, লোকে যাহা বলে
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে।
ভেবেছিনু, হায় ! দেখি ভ্রান্তি ভাব ধরি
ডুবাইছ, দেখিতেছি ক্রমে এই তরী ;
অদয়ে ! অতল দুঃখসাগরের জলে
ডুবিনু ; কি যশ তব হবে বঙ্গ-স্থলে ?"

সুখ, দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্ সকল অবস্থাতেই যে তিনি বাগ্দেবীর ক্রোড়ে বিশ্রামলাভের চেষ্টা করিতেন তাহা আমরা তাঁহার জীবনের প্রত্যেক অংশেই প্রদর্শন করিয়াছি। এ সময়েও তাঁহার কবিতানুশীলনের বিরাম ছিল না। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ত এইরূপ;—কিন্তু তাঁহার কোন আত্মীয় বলেন যে, "একদিন এই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখি যে, তাঁহার গৃহের প্রাঙ্গণে ও নিম্নতলে, তাঁহার কোন উত্তমর্ণ ও তাহার অনুচরগণ কোলাহলসহ তাঁহার প্রতি কটূক্তি করিতেছিল ; কিন্তু উপরিতলে বসিয়া মধুসূদন অব্যাহত চিত্তে দান্তের কবিতার অনুকরণ করিতেছিলেন। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।" কিন্তু মধুসূদন তখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে আত্মবিস্মৃতির জন্য কবিতার অপেক্ষা অধিকতর উত্তেজক কোনও সামগ্রীর আবশ্যক হইয়াছিল। কবিতায় তাঁহার হৃদয়ের যে যন্ত্রণা দূরীভূত না হইত, মদিরায় তিনি তাহা প্রশমিত করিবার চেষ্টা পাইতেন। ঋণজনিত অপমান যখন অসহ্য হইত তখন তিনি অবিশ্রান্ত মদিরা পান করিতেন। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে এরূপে আত্মঘাতী হইতে দেখিলে যে কিরূপ ক্লেশ হয়, তাহা বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। মধুসূদন নিজেও জানিতেন যে তিনি আত্মহত্যা করিতেছেন ; কিন্তু আত্মহত্যা ভিন্ন ঋণদায় ও মানসিক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় নাই ভাবিয়াই তিনি সুরাচ্ছলে বিষপান করিতেন।

য়ুরোপ-প্রবাসকাল হইতে মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত মধুসূদনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। মনোমোহনবাবু মধুসূদনকে এ অবস্থায় যথাসাধ্য সাহায্য ও সান্ত্বনাদানে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন —"একদিন এই সময় মধুসূদনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখি যে, বেলা দ্বি-প্রহরের সময় তিনি গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া অতি উগ্র জলস্পর্শশূন্য সুরাপান করিতেছেন। আমি নিকটে যাইয়া বলিলাম, এ কি, আপনি এ কি করিতেছেন? ইহার পরিণাম কি হইবে তাহা কি আপনি জানেন না?" মধুসূদন বলিলেন—"মনোমোহন, তোমার কি তবে ইচ্ছা যে আমি নিজের কণ্ঠে নিজে অস্ত্রাঘাত করি?" মনোমোহনবাবু বলিলেন—"সে কি, আমি তাহা বলিব কেন?" মধুসূদন বলিলেন— "এই দ্বিপ্রহরের সময় এরূপ ভাবে সুরাপানের পরিণাম যে কি তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; কিন্তু আমার আর উপায় নাই। কণ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিলেও যাহা, এরূপ সুরাপানের পরিণামও তাহাই ঘটিবে। তবে অস্ত্রাঘাত অপেক্ষা ইহাতে আপাততঃ ক্লেশ অল্প বলিয়াই আমি অস্ত্রের পরিবর্ত্তে সুরা ব্যবহার করিতেছি।"*

মানসিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা

হতভাগ্য কবির শেষজীবন কিরূপ নিদারুণ যন্ত্রণায় অতিবাহিত হইয়াছিল এই একটিমাত্র ঘটনা হইতে তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। এরূপ অত্যাচারে ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের পরিণাম যেরূপ হইবার সম্ভাবনা ক্রমে সেইরূপই হইল। অল্পদিনের মধ্যেই মধুসূদন নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইলেন; রোগ একপ্রকারের নয়। উদরী, কণ্ঠনালীর প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াব্যতিক্রম প্রভৃতি নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি তাঁহাকে

শারীরিক অবস্থা

* মনোমোহনবাবু বলিয়াছিলেন, মধুসূদনের শেষ কথাগুলি অবিকল এই :—
This is a process equally sure but less painful.

আক্রমণ করিল। বিধাতা তাঁহাকে যে অনবদ্য স্বাস্থ্য প্রদান করিয়াছিলেন, নিজের অত্যাচারের ফলে তিনি তাহা হইতে এইরূপে বঞ্চিত হইলেন। যন্ত্রণার আর সীমা রহিল না। একে দারুণ অর্থাভাব, তাহার উপর পীড়ার যন্ত্রণা। মধুসূদন ধীরতার সহিত যদিও এ সকল সহ্য করিতেন, কিন্তু তাঁহার ঋণদাতাগণ যে প্রতিপদে তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণের ভীতি প্রদর্শন করিত, তাহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশকর বোধ হইত। ঋণদায়ে কারাগারে মৃত্যু অপেক্ষা আত্মহত্যা করাই তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন। কবিজীবন দুঃখময়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ; কিন্তু এমন মর্ম্মান্তিক দুঃখ বুঝি পৃথিবীর অতি অল্প কবির জীবনেই ঘটিয়াছে। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে আর কোন উন্নতির আশা নাই দেখিয়া

পঞ্চকোটের রাজার অধীনে কার্য্য

মধুসূদন এই সময় মানভূমের অন্তর্গত পঞ্চকোটের রাজার আইন-উপদেষ্টার (Legal adviser) পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কার্য্যটি স্থায়ী হইলে আর কিছু না হউক, তাঁহার অন্নাভাব-ক্লেশ দূরীভূত হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজার চপলতায় বিরক্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে তিনি এই কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি মানভূম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পূর্ব্ব হইতেই নানাবিধ পীড়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল; সুতরাং নিয়মমত নিজের ব্যবসায় চালাইতে তিনি সক্ষম ছিলেন না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল। মধুসূদনের পত্নীরও শরীর পূর্ব্ব হইতে ভগ্ন হইয়াছিল; এই সময় তিনিও অতি কঠিন রূপ পীড়িতা হইলেন। পতি-পত্নী উভয়ের এইরূপ অবস্থা, চিকিৎসার ও পথ্যের অভাব, দুইটি অপোগণ্ড শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার এবং তাহার উপর ঋণদাতাগণের নিপীড়ন, সুতরাং মধুসূদনের যন্ত্রণা পূর্ণমাত্রায়

উপস্থিত হইল। এতদিন বন্ধুগণের প্রদত্ত সাহায্যের এবং ঋণের দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ হইতেছিল, ক্রমশঃ উভয়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিল। পুনঃপ্রাপ্তির আশা না থাকিলে কয়জন ঋণ দান করিতে পারেন? অন্যের প্রদত্ত সাহায্যের উপরই বা কতদিন নির্ভর করা চলে? গৃহসজ্জা, পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মধুসূদন দিনপাত করিতে বাধ্য হইলেন; ক্রমশঃ তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিল। তখন সত্য সত্যই অন্নাভাব উপস্থিত হইল।

সাংসারিক অবস্থা

শিশুদিগের কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া মধুসূদনকে ও তাঁহার পত্নীকে কোন কোন দিন অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকিতে হইত। সুস্থ থাকিলে যে কোনরূপে হউক তিনি কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিতেন; কিন্তু শয্যাশায়ী হইয়া তিনি আর কি করিবেন? সে অবস্থায় যাহা সম্ভবপর তিনি তাহার ক্রটি করেন নাই। স্মৃতিশেষ বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষ ও অনুষ্ঠাতৃগণ এই সময় তাঁহাকে তাঁহাদিগের রঙ্গশালার জন্য একখানি নাটক রচনা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহাদিগের প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্যের প্রত্যাশায় মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও তাঁহার শেষ গ্রন্থ "মায়াকানন" রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন তখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে ধীরতার সহিত গ্রন্থ-রচনা করা সম্ভবপর ছিল না; নিজের বিষাদময় জীবনের প্রতিবিম্বপাত করিয়াই তিনি স্বরচিত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের জীবনের ন্যায় মায়াকাননও মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদের ও দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি মায়াকানন স্বয়ং সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাহার কতকগুলি অংশ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন মাত্র। বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ সেই সকল খণ্ডিত অংশ স্বেচ্ছানুরূপ সংযোজিত করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সংক্ষেপে মায়াকাননের বর্ণনীয় বিষয় এই:—সিন্ধুদেশে মায়াকানন

নামে এক নিবিড় অরণ্যানী বর্ত্তমান ছিল, এবং তাহার অভ্যন্তরে অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবীর এক পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মায়াকানন সম্বন্ধে সিন্ধুদেশে এইরূপ এক জনশ্রুতি প্রচারিত ছিল যে, "যে লগ্নে দিনমণি কন্যারাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন, সেই সুলগ্নে যদি কোন পবিত্র-স্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা ঐ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করেন, তবে তিনি কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ পতিকে, আর পুরুষ হইলে আপনার পত্নীকে দেখিতে পান।" এই জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া অনেক বিবাহপ্রার্থী পুরুষ ও রমণী মায়াকাননে উপস্থিত হইতেন। একদিন সিন্ধুদেশের রাজকুমার অজয় ও গান্ধারদেশের রাজকুমারী ইন্দুমতী উভয়েই আপন আপন ভবিষ্যৎ পত্নী ও পতি সন্দর্শনের প্রত্যাশায় পরস্পরের অজ্ঞাতভাবে মায়াকাননে প্রবেশ করিয়া উভয়কে সন্দর্শন করেন, কিন্তু অজয় ও ইন্দুমতীর সম্মিলন বিধাতার অভিপ্রেত ছিল না। পরস্পরের প্রথম সন্দর্শনের দুই বৎসর পরে উভয়েই নিরাশ হৃদয়ে আত্মহত্যার দ্বারা দেবীর সম্মুখে যন্ত্রণার অবসান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাই সংক্ষেপে মায়াকাননের বর্ণনীয় বিষয়। মধুসূদন তখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আত্মহত্যা দ্বারা যন্ত্রণার অবসান করিবার ইচ্ছাই তাঁহার হৃদয়ে দিবা-রাত্রি জাগরূক থাকিত। সেই জন্য তাঁহার রচিত গ্রন্থেও তাদৃশ ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। যে অবস্থায় এই সময় মধুসূদনকে দিনপাত করিতে হইত এবং যে অবস্থায় তিনি মায়াকানন রচনা করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে ব্যথিত হইতে হয়। রোগের যন্ত্রণায় কখন কখন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন; রক্ত-বমনে শরীর মধ্যে মধ্যে অবসন্ন হইয়া আসিত; অথচ তাহারই মধ্যে অর্থাভাব-ক্লেশ কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইবে ভাবিয়া লেখনী-হস্তে যখন যে ভাবটি হৃদয়ে উদিত হইত তাহা লিপিবদ্ধ

মায়াকানন

করিতেন। নিজের যখন লেখনীধারণের সামর্থ্য না থাকিত তখন কোন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি নিকটে থাকিলে তাঁহার দ্বারা অভিপ্রেত বিষয় লিখাইয়া লইতেন। এরূপ ভাবে রচিত গ্রন্থ যে নির্দ্দোষ বা চিত্তাকর্ষক হইতে পারে না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সেই জন্য মায়াকাননের দোষগুণ সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ না করাই সঙ্গত।

নাটক-রচনার সঙ্গে মধুসূদনের সাহিত্যিক-জীবন আরব্ধ হইয়াছিল, নাটক-রচনার সঙ্গেই তাহা এইরূপে সমাপ্ত হইল। মায়াকানন মধুসূদনের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত নয়; কিন্তু যিনি কবির জীবনের এই সময়কার ঘটনাবলী অবগত আছেন, তিনি ইহা পাঠ করিবার সময় বুঝিতে পারিবেন যে, ইহার অনেক স্থল কবির হৃদয়ের শোণিত দ্বারা লিখিত। হায়! প্রতিভার সঙ্গে চরিত্র, নীতিজ্ঞান ও সাংসারিক বুদ্ধি মিলিত থাকিলে, বোধ হয় পৃথিবীর অনেক কবিরই জীবন তাঁহাদিগের কাব্যের ন্যায় শোকান্ত হইত না।

মায়াকাননের ন্যায় "বিষ না ধনুর্গুণ" নামক আরও একখানি নাটক মধুসূদন এই সময় বঙ্গরঙ্গভূমির জন্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অতি সামান্য অংশমাত্রই তিনি রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে যে পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অসময়ে যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল; কিন্তু সেরূপ সাহায্যের দ্বারা তাঁহার ক্লেশ স্থায়ীভাবে দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? বঙ্গদেশে সে সময়ে মধুসূদনের গুণ পক্ষপাতী ব্যক্তির অভাব ছিল না, সুতরাং মধুসূদনের দুরবস্থা সাধারণের গোচর করিলে বঙ্গসমাজ যে তাঁহার দুঃখে উদাসীন থাকিতেন তাহা বোধ হয় না; কিন্তু নিজের দুরবস্থা নিজে সাধারণের গোচর করা মধুসূদনের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না; তিনি বরং সপরিবারে অনশনে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু নিতান্ত আত্মীয় ও সুহৃদ্ ভিন্ন

কাহারও নিকট কখনও নিজের দুরবস্থা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। যাঁহাদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ঋণদান বা সাহায্যদান করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগেরও বিশেষ অপরাধ ছিল না। নিজের দুর্দ্দশার সূত্রপাত হইবার পরে মধুসূদনকে তাহার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার বিবাহ দিতে হইয়াছিল; জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি অনেকেই সে সময় তাঁহাকে যথাযোগ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীকে একবার তাঁহার গ্রন্থাবলী উপহার প্রেরণ করিলে তিনিও মধুসূদনকে পাঁচ শত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

পীড়িতাবস্থায় শেষ সাহায্য

রোগশয্যায় মধুসূদন যাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে স্বনামখ্যাত, স্বদেশবৎসল ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কোন কার্য্যে প্রশংসার প্রার্থী ছিলেন না; কিন্তু আত্মীয় বন্ধুদিগের বিপদে তিনি নীরবে যেরূপ সাহায্যদান ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, অতি অল্প লোকই তাহা অবগত আছেন। মধুসূদন এবং তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটা মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ন্যায় স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ও মধুসূদনকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইঁহাদিগের দুইজনের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে মধুসূদনকে আরও দুর্দ্দশায় জীবন শেষ করিতে হইত, এবং তাহা হইলে তাঁহার শিশু দুইটিকে প্রকৃতই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শেষাবস্থায় রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা ঋণের যন্ত্রণাই মধুসূদনের পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল। ঋণদাতাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য কিছুদিন কলিকাতা হইতে অন্যত্র বাস করা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল।

এই সময় উত্তরপাড়াস্থ সুপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার দুর্দ্দশা অবগত হইয়া সহৃদয়তার সহিত তাঁহাকে উত্তরপাড়ায় যাইয়া অবস্থিতির জন্য আহ্বান করেন। মধুসূদন তদনুসারে দুই তিন মাস উত্তরপাড়ায় গঙ্গাকূলবর্ত্তী প্রসিদ্ধ লাইব্রেরিগৃহে বাস করিয়াছিলেন।

উত্তরপাড়ায় বাস

ইহার পূর্ব্বে আরও একবার তিনি সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। জয়কৃষ্ণবাবু নিজে, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রাজা প্যারীমোহন এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলে মধুসূদনকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়াতে মধুসূদনের যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল। জয়কৃষ্ণবাবুর সহৃদয় ও পরদুঃখকাতর পৌত্র বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মধুসূদনের নিকট সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায় যতদূর সান্ত্বনা-দান করা সম্ভবপর তাহার কিছুই ক্রটি করেন নাই। তাঁহার সদ্ব্যবহারে মধুসূদন পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। উত্তরপাড়ায় মধুসূদন একরূপ মৃত্যুশয্যায় শয়ান ছিলেন বলিলেও হয়; কিন্তু সেখানেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কবিতানুশীলনের বিরাম ছিল না। যে দিন একটু সুস্থ থাকিতেন, সে দিন তাঁহার প্রিয় কবি মিল্টন ও দান্তে প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে অনর্গল কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন এবং কেহ তাঁহাকে দেখিতে আসিলে নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন। মধুসূদনের শেষজীবনের বিবরণ লেখক এবং পাঠক উভয়ের পক্ষে ক্লেশকর। এক এক দিনের ঘটনা চিন্তা করিলে মনে হয় যে, বঙ্গদেশের দীনতম ভিক্ষুকও বুঝি তাঁহার অপেক্ষা শান্তিতে প্রাণত্যাগ করে। এক দিনের একটি ঘটনা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। মধুসূদনের উত্তরপাড়ায় অবস্থান কালে গৌরদাস সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। একদিন তিনি তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন যে, একটি মলিন শয্যার উপর শয়ন করিয়া মধুসূদন মুহুর্মুহু রক্ত বমন করিতেছেন। তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটা নিম্ন গৃহতলে পতিত হইয়া রোগের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছেন। গৌরদাসবাবু হেন্‌রিয়েটাকে মূর্চ্ছিতপ্রায় দেখিয়া তৎকালোচিত সাহায্য দানের জন্য অগ্রসর হইলেন; কিন্তু নিজের যন্ত্রণার অপেক্ষা স্বামীর অবস্থাই তখন হেন্‌রিয়েটার পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল। তিনি অতি কাতরস্বরে গৌরদাসবাবুকে বলিলেন—"আমার জন্য চিন্তা নাই; আমি মরিতে ভয় করি না; যদি পারেন আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা করুন।" গৃহের এক দিকে এই দৃশ্য! অপর দিকে একটি পাত্রে কতকগুলি পর্য্যুষিত অন্ন-ব্যঞ্জন পড়িয়াছিল। মধুসূদনের ক্ষুধাতুর শিশু দুইটি কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সেই পর্য্যুষিত অন্নে উদরপূর্ত্তি করিয়াছিল। তাহাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের দুর্গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অসংখ্য মক্ষিকা রোগীদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। হায়! এই কি মেঘনাদবধের কবির উপযুক্ত অবস্থা! যিনি কল্পনানয়নে লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণনাগুণে তাহা পাঠকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অবতারিত করিয়াছিলেন, সংসারের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে এই অবস্থাতেই জীবন শেষ করিতে হইয়াছিল। আত্মকৃত কার্য্যের পরিণাম অতিক্রম করা কাহার সাধ্য? মধুসূদন স্বহস্তে যে বিষতরুর বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাহারই ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল।

পীড়াকালীন দুরবস্থা

উত্তরপাড়ায় তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া মধুসূদন মৃত্যুর ৭।৮ দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। সপরিবারে কলিকাতায় স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারেন, তখন তাঁহার সাংসারিক অবস্থা এরূপ ছিল না। নিদারুণ রোগে তিনি একেবারে উত্থানশক্তিরহিত হইয়াছিলেন; কোনও স্থান হইতে একটি কপর্দ্দকও

আয়ের প্রত্যাশা ছিল না; ইহার উপর তাঁহার পত্নী কতক্ষণে পরলোক-গমন করিবেন এইরূপ অবস্থাপন্না হইয়াছিলেন। কে তাঁহাদিগের ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবেন, কে বা তাঁহাদিগের সেবা, শুশ্রূষা করিবেন?

আলিপুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে গমন

সুতরাং মধুসূদনের বন্ধুগণ তাঁহার পত্নীকে তাঁহার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার আশ্রয়ে রাখিয়া তাঁহাকে আলিপুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন। হায়! বঙ্গের নব কবি-শিরোমণির ভাগ্যে এই শোচনীয় পরিণাম ছিল! নিজের সুখের জন্য তিনি যে জনকজননীর প্রাণে বেদনা দিয়া স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশ্রয়গ্রহণ দ্বারা এত দিন পরে তাঁহাকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। মনুষ্য যতই যন্ত্রণা ভোগ করুক, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখিতে পাইলে তাহার যন্ত্রণার অনেক উপশম হয়; কিন্তু আত্মীয় বন্ধুগণের মুখ দেখা দূরে থাকুক, তাঁহার মৃত্যুশয্যাশায়িনী হতভাগিনী পত্নী কি অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, মধুসূদনের পক্ষে তাহাও দর্শন করিবার সম্ভাবনা ছিল না। মধুসূদনের জীবন আদ্যোপান্ত দুঃখের কাহিনী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; কিন্তু এরূপ মানসিক যন্ত্রণা তিনি জীবনে আর কখনও ভোগ করেন নাই। নিদারুণ রোগের মধ্যে যখন এক একবার তাঁহার চৈতন্য হইত, তখন পীড়িতা পত্নী ও শিশু দুইটির কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিত। কখনও কষ্টে হৃদয়ের ভাব সংযত করিতেন, কখনও বালকের ন্যায় অধীরভাবে ক্রন্দন করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার এবং তাঁহার পত্নীর পীড়া ক্রমে শেষাবস্থায় উপনীত হইল। পতি-পত্নীর মধ্যে কে অপরকে ফেলিয়া অগ্রে পরলোকগমন করিবেন ইহাই তখন তাঁহাদিগের উৎকণ্ঠার বিষয় হইল। মধুসূদন এত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তথাপি বুঝি তাঁহার অপরাধের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই;

—তাই বিধাতা তাঁহার শিক্ষার জন্য চরম দণ্ড বিধান করিলেন।

হেন্‌রিয়েটার মৃত্যু

মধুসূদনের মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহার শেষজীবনের সুখদুঃখ-সঙ্গিনী অভাগিনী হেন্‌রিয়েটা পরলোকগমন করিলেন। মধুসূদন তখন দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহার এক পূর্ব্বতন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে এ সংবাদ প্রদান করিল। মধুসূদনের অশ্রুর উৎস তখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তিনি কেবল কাতরস্বরে বলিলেন—"জগদীশ! আমাদিগের দুইজনকেই এক সঙ্গে সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু আমার আর অধিক বিলম্ব নাই; আমি সত্বরই হেন্‌রিয়েটার অনুবর্ত্তী হইব।" মধুসূদন যদিও বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার যন্ত্রণার অবসান হইয়া আসিয়াছে এবং সে অবস্থায় অধিক দিন তাঁহাকে পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে না, তথাপি এই বিপৎপাতে তাঁহার হৃদয় একেবারে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত সংস্থান তাঁহার ছিল না; বন্ধুবান্ধবগণের অনুগ্রহে তাহা কোনরূপে সংগৃহীত হইল। হতভাগিনী পত্নীর সমাধির উপর অশ্রুপাত করিয়া তিনি যে শান্তিলাভ করিবেন, দারুণ পীড়া তাঁহাকে সে সৌভাগ্য হইতেও বঞ্চিত করিয়াছিল। মনোমোহনবাবু ও তাঁহার আর দুই একটি সুহৃদ্ হেন্‌রিয়েটাকে সমাধিস্থ করিয়া দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মধুসূদনকে এই সংবাদ দিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। পাছে অর্থাভাবে পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হইয়া থাকে, সেই আশঙ্কায় মধুসূদনের হৃদয় উদ্বিগ্ন ছিল। তিনি মনোমোহনবাবুকে দেখিয়া বলিলেন—"কেমন মনোমোহন, সকল ত

মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত কথোপকথন

ভদ্রোচিত সম্পন্ন হইয়াছে? কোন ত্রুটি ত হয় নাই?" মনোমোহনবাবু বলিলেন—"না; আমাদিগের এ অবস্থায় যাহা সম্ভবপর তাহার কিছুরই ত্রুটি হয় নাই।" মধুসূদন তখন মনোমোহনবাবুকে

বলিলেন—"মনোমোহন! তুমি যত্নের সহিত সেক্সপীয়ার পড়িয়াছিলে; ম্যাক্‌বেথের সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয়?"

মনোমোহনবাবু বলিলেন—"কোন্ কয়টি পংক্তি?"

মধুসূদন বলিলেন—"লেডী ম্যাক্‌বেথের মৃত্যু-সংবাদে ম্যাক্‌বেথ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কয়টি পংক্তি। আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, কোনও কথা আমার স্মরণ হয় না, কিন্তু দেখ দেখি, আমি সেই কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করিতেছি, আমার কোন ভ্রম হয় কি না।" মধুসূদন এই বলিয়া ম্যাক্‌বেথ হইতে সুস্পষ্টরূপে সেই কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করিলেন; * এবং করিয়া বলিলেন—"কেমন মনোমোহন, ঠিক হইয়াছে ত?" মনোমোহন বাবু বলিলেন—"ঠিক হইয়াছে; কিন্তু এখন এ সকল কথায় প্রয়োজন কি? আপনি আরোগ্যলাভ করিবেন, চিন্তা নাই।" শুনিয়া মধুসূদন একটু হাসিলেন। বোধ হয় হাসির অর্থ এই যে, আমি যে কিরূপ আরোগ্যলাভ করিব, আমার মনই তাহা বুঝিতেছে। পরে মনোমোহন বাবুকে বলিলেন—"দেখ, এই চিকিৎসালয়ের পরিচারক এবং ধাত্রীদিগের পুরস্কার দিতে পারি, আমার এমন সম্বল নাই। ইহারা অর্থ-প্রয়াসী, ইহাদিগকে কিছু কিছু পুরস্কার দিতে পারিলে ইহারা আমায়

* "To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day.
To the last syllable of recorded time,
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow; a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage.
And then is heard no more; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing."—

একটু অধিক যত্ন করিত। যদি প্রতিদিন একটি করিয়া টাকা ব্যয় করিতে পারিতাম, তবে এ অবস্থায়ও কিছু শান্তি পাইতাম।” মনোমোহনবাবু বলিলেন—“প্রতিদিন একটি করিয়া টাকা ? সে জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না, যে উপায়েই হউক, তাহা সংগৃহীত হইবে।” তখন মধুসূদন বলিলেন—“মনোমোহন ! তোমায় আর অধিক কি বলিব ? আমার শিশুগুলি যেন অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ না করে, এই দেখিও।” মনোমোহনবাবু বলিলেন—“আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যদি আমার নিজের সন্তানগণের অন্নাভাব না হয়, তবে আপনার শিশুগুলিরও হইবে না।”* মধুসূদনের বিশুষ্ক মুখ ক্ষণকালের জন্য প্রফুল্ল হইল ; তিনি সস্নেহে মনোমোহনবাবুর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, “মনোমোহন ! জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।” মনোমোহনবাবু ইহার পর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মনোমোহনবাবুর সঙ্গে এই বিদায়ের পর মধুসূদন তিন দিবস জীবিত ছিলেন। সেই তিন দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি নিজের অতীত জীবনের কার্য্যাবলীর আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই যে তাঁহার তাদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, এ চিন্তা মর্ম্মান্তিক শেলের ন্যায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিত। কেহ তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তিনি তাঁহার নিকট মুক্তকণ্ঠে আপনার ত্রুটী স্বীকার করিতেন, এবং উচ্ছৃঙ্খলতার ও অসদাচারের পরিণাম কি তাহা বুঝাইবার জন্য নিজের অবস্থার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সাবধান

* মনোমোহনবাবু সে সত্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি পুত্রবৎ স্নেহে মধুসূদনের পুত্র আলবার্ট নেপোলিয়নকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। আলবার্ট তাঁহারই উদ্যোগে অহিফেন-বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Sub-Deputy Opium Agent এর কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অল্পদিন হইল তরুণ বয়সে আলবার্টের মৃত্যু হইয়াছে।

হইতে বলিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবাদ দিয়া আনাইয়া তিনি অনেকক্ষণ অবধি তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন এবং ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি সেই দয়াময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া মরিতেছি। তিনি যে পাপীতাপীর উদ্ধারের জন্য খৃষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন আমি উহাতে বিশ্বাস করি।" সংসার কেবল কর্ম্মক্ষেত্র নয়, মানবাত্মার শিক্ষাক্ষেত্র। কেহ বাল্যে, কেহ বা যৌবনে, কেহ বা সম্পদে এবং কেহ বা বিপদে শিক্ষালাভ করেন। রোগ, শোক এবং দরিদ্রতার কশাঘাত প্রাপ্ত না হইলে দুরন্ত মানব-সন্তানের চেতনা হয় না। যিনি যে দণ্ডের উপযুক্ত, বিশ্ববিধাতা তাঁহার প্রতি সেইরূপ দণ্ডবিধান করিয়া তাঁহাকে উদ্বোধিত করেন। ভগবানের অবাধ্য সন্তান মধুসূদন এতদিন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই; তাই সেই ন্যায়বান্ প্রভু স্বীয় দয়াগুণে তাঁহার প্রতি অতি কঠোর দণ্ড বিধান করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিলেন। আত্মকৃত কার্য্যের অনিষ্টকারিতা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া এবং যিনি ইহ পরকালের প্রভু তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া মধুসূদন যে পৃথিবীর শিক্ষাকার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন ইহা চিন্তা করিলে তাঁহার প্রথম জীবনের দুর্ব্বলতার কথা আমাদিগের আর স্মরণ থাকে না। যে দিন তিনি পরলোকগমন করেন সেই দিন প্রাতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যমোহন দত্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মধুসূদনের শরীর তখন অবসন্ন এবং বাঙ্-নিষ্পত্তির শক্তি লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন—"ত্রৈলোক্যমোহন! জীবনের কোনও আশা পূর্ণ হয় নাই, অনেক আক্ষেপ লইয়া মরিতেছি, এখন বলিবার শক্তি নাই; তুমি

অন্তিম অপরাধ-স্বীকার ও প্রার্থনা

আর এক সময় আসিও, অনেক কথা বলিবার আছে, তোমায় বলিব।" কিন্তু আর বলা হইল না; প্রাণের বেদনা ভাষায় ব্যক্ত করিবার অবসর বিধাতা তাঁহাকে দিলেন না; সেই দিন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন, রবিবার, বেলা দ্বিপ্রহর দুইটার সময় তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। বাল্যে যাঁহার সেবার জন্য দাসদাসী ব্যগ্র হইয়া থাকিত, পাছে কোনও বিষয়ে তাঁহার পরিচর্য্যার ত্রুটী হয় এই চিন্তায় যাঁহার পিতা, মাতা ও আত্মীয়গণ ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন, আজ এই শেষ দিনে চিকিৎসালয়ের ভৃত্য ও শুশ্রূষাকারিণী ভিন্ন তাঁহার মুখে জলগণ্ডূষ দিবার জন্য একজনও কেহ নিকটে ছিলেন না। রাজপথের ভিক্ষুক ও অনাথগণের সহিত একত্রে বঙ্গের বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি এইরূপে পরলোকগমন করিলেন।

পরলোক-গমন

যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য বিধাতা মধুসূদনকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। জননী-রূপিণী মাতৃভাষার সেবা করিয়া এবং আত্মসংযমের অভাবে প্রতিভার পরিণাম কতদূর শোচনীয় হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার আত্মা প্রলোভনময় পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধলোকে প্রস্থান করিল। সংসারের পিচ্ছিল-বর্ত্মে ভ্রমণ করিতে করিতে অতি সবল পুরুষকেও স্খলিতপদ হইতে হয়; দুর্ব্বল মধুসূদনের কথাত স্বতন্ত্র; কিন্তু তিনি জীবনে যে সকল ভ্রম-প্রমাদ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবী হইতে তিনি যে অভিজ্ঞতা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণ করিবে। সুখে অথবা দুঃখে তাঁহার জীবন যে ভাবে অতিবাহিত হউক তাঁহার মানব-জন্ম-ধারণ নিরর্থক হয় নাই; তিনি তাঁহার স্বদেশকে এক বিষয়ে উন্নত ও গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধন করিয়া তিনি তাঁহার স্বদেশীয়গণের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, বিশ্ববিধাতা তজ্জন্য

অবশ্যই তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন। পরলোকে তাঁহার জ্ঞানপিপাসু আত্মা যেমন অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ইহলোকেও তেমনই তাঁহার কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহার মাতৃভাষার সেবকগণ কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার নাম স্মরণ করিবেন। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন তাঁহার স্বদেশীয়গণ সত্যই তাঁহার কাব্যসমূহ হইতে

"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

# উপসংহার

মধুসূদনের জীবনের বিষাদময়ী আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। এইবার আমরা তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের আলোচনা করিয়া আমাদিগের গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিব।

মধুসূদনের অনুষ্ঠিত কার্য্য

গ্রন্থ গ্রন্থকর্ত্তার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব-ফলক; পৃথিবীর অন্যান্য অনেক গ্রন্থকারের ন্যায় মধুসূদনেরও গ্রন্থাবলীতে আমরা তাঁহার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে পারি। একেই কি বলে সভ্যতা ও চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি তাঁহার জীবনের যে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন আমরা তাহার কথা বলিতেছি না। যে চিত্তবৃত্তি পারিবারিক ও সাহিত্যিক প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহাকে প্রণোদিত করিত, আমরা তাহারই ভাবসাদৃশ্যের কথা বলিতেছি। মধুসূদনের প্রতিভা এবং তাঁহার চরিত্র উভয়েই পরস্পরের অনুরূপ। সৎপথেই হউক আর অসৎপথেই হউক, পারিবারিক জীবনেই হউক আর সাহিত্য-সম্বন্ধেই হউক কোনরূপ নিষেধ-বিধির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। ইহারই ফলে একদিকে যেমন সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি অবলম্বিত ধর্ম্মে, বৈবাহিক সম্বন্ধে এবং আশ্রমিক আচার ব্যবহারে স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, অপরদিকেও তেমনই স্বদেশীয় সাহিত্যে চিরপ্রচলিত প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়া তিনি নূতন নূতন রীতি প্রবর্ত্তনে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য মেঘনাদবধ ও তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক কৃষ্ণকুমারী যেমন বিষাদান্ত, তাঁহার নিজের জীবনও তেমনি মর্ম্মান্তিক শোকান্ত। সকল পাইয়াও মধুসূদনের ন্যায় হতভাগ্য কবি বঙ্গদেশে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। দারিদ্র্য

কবিজীবনের চিরসহচর; সুতরাং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত বলিয়া আমরা মধুসূদনকে হতভাগ্য বলিতেছি না। সাংসারিক সুখ-সম্পদের জন্য মনুষ্য বিধাতার নিকট সাধারণতঃ যে সামগ্রী কামনা করে, যাচ্ঞা ব্যতিরেকেই তিনি তাহার অধিকাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্নেহময় জনক-জননী, মধ্যবিত্তরূপ ঐশ্বর্য্য, অনবদ্য স্বাস্থ্য, সরল উদার প্রাণ, অনন্যসাধারণ প্রতিভা—এই সকলের অধিকারী করিয়া জননী প্রকৃতি তাঁহাকে সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আত্মীয় বন্ধুদিগকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিতেন কে? পরকে আপনার করিবার জন্য তেমন করিয়া প্রাণ ঢালিতে জানিতেন কয় জন? গুণবানের প্রতি সম্মান, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, অপকারীর অপকারে উপেক্ষা প্রভৃতি গুণে কয়জন তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন? তাঁহার সহাধ্যায়ী বাবু ভোলানাথ চন্দ্র বলেন—"ঈর্ষা বা বিদ্বেষ কাহাকে বলে মধুসূদন তাহা জানিতেন না; তাঁহার হৃদয় মধুময় ছিল। There was no gall, no acrimony in him, he was all মধু।" তাঁহার জীবনের প্রাতঃকাল কি মনোহর! কনক-কিরণ-রঞ্জিত ঊষার ন্যায় তাহা কি অপূর্ব্ব শোভাই বিকাশ করিয়াছিল। পিতামাতার তিনি সর্ব্বস্বধন; লক্ষপতির সন্তানের ন্যায় সুখ-স্বচ্ছন্দে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত; যে বিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করিতেন তাহার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তিনি বৃহস্পতিতুল্য। তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নও ইহার উপযুক্ত। ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের তিনি ব্যারিষ্টার; পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা সমূহে তিনি সুপণ্ডিত; দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার সুহৃদ্ ও প্রতিভার উৎসাহদাতা; সমকালবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে প্রতিভায় তিনি অগ্রগণ্য; কিন্তু এই মনোহর প্রভাতের এবং এই সমুজ্জ্বল মধ্যাহ্নের পর কি ঘোরান্ধকারময়ী রজনী মধুসূদনের জীবনাকাশ আবৃত করিয়াছিল! যে যন্ত্রণায় তাঁহার শেষজীবন অতিবাহিত

হইয়াছিল, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবীর কীট-পতঙ্গেরও মস্তক রাখিবার স্থান আছে, কিন্তু বঙ্গের নব্য-কবি-শিরোমণির তাহা ছিল না। যে পরান্নভোজন ও পরাবসথে শয়ন আমাদিগের নীতি-শাস্ত্রকারগণ মৃত্যুতুল্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, মধুসূদনের ভাগ্যে তাহারও অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ ঘটিয়াছিল! আশ্রয়ের অভাবে তাঁহাকে পরগৃহে বাস এবং নিজান্নের অভাবে তাঁহাকে পরদত্ত পিণ্ডে জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রিয়তম পুত্র-কন্যাগণ, কখনও উপবাসে, কখনও বা পর্য্যুষিত অন্নে দিনপাত করিত। তিনি যাঁহাদিগকে প্রাণের অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বিনা পথ্যে বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিলেন; মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া এ সমস্তই তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছিল। আর পরিশেষে, তিনি নিজে রাজপথের ভিক্ষুকের ন্যায় দাতব্য-চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাকে আত্মীয়ের অপেক্ষাও আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেন, মৃত্যুশয্যায় চিকিৎসালয়ের শুশ্রূষাকারিণী ভিন্ন আর কেহ যে তাঁহার মুখে জলগণ্ডূষ দিতে নিকটে ছিলেন না, ইহার অপেক্ষা অধিক শোচনীয় পরিণাম আর কি হইতে পারে? সেইজন্যই আমরা বলিয়াছি যে সকল পাইয়াও মধুসূদনের ন্যায় হতভাগ্য কবি বঙ্গদেশে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সত্যই তাঁহার জীবন তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যের ন্যায় শোকান্ত; একটিতে অপরের ছায়া সুস্পষ্ট বর্ত্তমান রহিয়াছে।

**বাঙ্গালা সাহিত্যে মধুসূদনের কার্য্য**

মধুসূদনের প্রতিভাগুণে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এক্ষণে আমরা তাহার আলোচনা করিব। তিনি সাধারণের নিকট অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তক বলিয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু অমিত্রচ্ছন্দের ন্যায় অভিনয়োপযোগী প্রহসন, বিয়োগান্ত-নাটক এবং চতুর্দ্দশপদী-কবিতাও

তাঁহার দ্বারা বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইংরাজী-শিক্ষিতগণের মধ্যে তিনিই প্রথমে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক-রচনা এবং প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিগণের আদর্শে কাব্য-রচনা করিয়া-ছিলেন। প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদিগের গৌরব অপহ্নবেচ্ছু ব্যক্তি কোন দেশেই বিরল নহে; সুতরাং মধুসূদনের নিন্দকের অভাব ছিল না; কিন্তু তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলাফল অতি স্থূলদর্শী ব্যক্তিও এক্ষণে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বঙ্গভাষা সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্করণ। মেঘনাদবধ রচনা অপেক্ষা ইহা আমরা তাঁহার প্রতিভার অধিকতর পরিচায়ক ও গৌরব-জনক কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করি। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত বিতর্ক করিয়া তিনি যে অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা বঙ্গভাষা যে কেবলই অমিত্রচ্ছন্দের উপযোগিনী এ কথা প্রতিপন্ন হয় নাই; বঙ্গভাষা যে, যে কোনও রূপ রচনার উপযোগিনী ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশপদী হউক আর দ্বাদশপদী হউক, অমিত্রচ্ছন্দ হউক, আর মিত্রচ্ছন্দ হউক, গীতি-কবিতা হউক, আর বীররসপ্রধান কাব্যই হউক বঙ্গভাষা কোনও একটি রীতির অনুপযোগিনী, এ কথা আর এখন কাহারও বিশ্বাস নাই। "মাতৃভাষারূপ রত্নপূর্ণ খনি"র দ্বার তিনি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন; যে কোন উদ্যোগী পুরুষ এক্ষণে তাহা হইতে রত্নাহরণে সমর্থ হইবেন।

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে মধুসূদনের দ্বিতীয় কার্য্য প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য আদর্শের সম্মিলন। ভারতের ভবিষ্যৎ সাহিত্য নিরবচ্ছিন্ন পাশ্চাত্য আদর্শে অথবা নিরবচ্ছিন্ন প্রাচ্য আদর্শে গঠিত হইবার আর সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী সাহিত্য ভারতবাসীদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছে, ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের অবসান হইলেও তাহার প্রভাব অন্তর্হিত হইবে না। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় রীতির সম্মিলনেই

ভাবী ভারত-সাহিত্য গঠিত হইবে। মধুসূদনের কাব্যে ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারত-কবির মাধুর্য্য ও কোমলতার সঙ্গে পাশ্চাত্য কবিগণের ওজস্বিতার সম্মিলন করিয়া তিনি বাঙ্গালা পদ্যকে সমুন্নত করিয়াছেন। ইতালীরাজ ভিক্তর ইমানুয়েল মধুসূদনের প্রতিভা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্বরূপ-কথনই হইয়াছে; তাঁহার কবিতা প্রকৃতই গ্রন্থিরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিয়াছে। মধুসূদনের গ্রন্থে বিজাতীয় ভাবের প্রাবল্যের জন্য আমাদিগের ক্লেশ হয়; কিন্তু তিনি পথ-প্রদর্শক; নূতন পথে পথ-প্রদর্শককে প্রায়ই স্খলিতপদ হইতে হয়। মধুসূদনের অনুবর্ত্তিগণ সাবধানতার সহিত তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিলে জাতীয়ভাব বিসর্জ্জন না করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে আরও সমুন্নত করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালাকাব্য ও কবিতাসম্বন্ধে মধুসূদনের তৃতীয় কার্য্য সাধারণের রুচি-সংস্কার। এখন যে আর বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কাব্য শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে সে সম্ভাবনা নাই। মেঘনাদবধ যে আদর্শ সংস্থাপিত করিয়াছে তাহা এখন বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবণতা নির্ণয় করিবে। ইংরাজী সাহিত্যই যে এই রুচি-পরিবর্ত্তনের মূল তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু মধুসূদনের কার্য্যও উপেক্ষণীয় নহে। তিনি এতগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন কিন্তু বীরাঙ্গনার তারা-পত্রিকা ভিন্ন আর কোন স্থলেই অসৎ আদর্শের বা অসৎ নীতির সমর্থন করেন নাই। যে লঘুচিত্ততা বহু বঙ্গীয় লেখকের রচনায় পরিব্যক্ত, মধুসূদনের রচনায় তাহা কুত্রাপি লক্ষিত হইবে না। তিনি অতি অল্প দিনমাত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন কিন্তু সেই অল্পদিনের মধ্যে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, অপর কাহারও কার্য্যের সহিত তাহার তুলনা হয় না। কাব্যে, নাটকে, গীতি-কবিতায় এবং প্রহসনে সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছে।

মধুসূদনের পূর্ব্ববর্ত্তী হউন বা পরবর্ত্তী হউন এক বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী কবি তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। পুরুষোচিত শক্তিতে বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই।* মধুসূদনের সঙ্গীতে অনেক স্থলে তালভঙ্গ হইয়াছে, রাগ-রাগিণীর ব্যভিচার ঘটিয়াছে, তথাপি সে সঙ্গীত পুরুষকণ্ঠোচিত; সুগায়িকা নটীর তানলয়বিশুদ্ধ কাকলীধ্বনি নহে। জলদ-নির্ঘোষের ও সাগর গর্জ্জনের ন্যায় সে সঙ্গীত আমাদিগকে চমকিত ও বিস্মিত করে। মেঘনাদবধ পাঠ করিতে করিতে অতি দুর্ব্বল হৃদয়ও উৎসাহে উদ্দীপিত হয়। বঙ্গসমাজ তন্দ্রাবেশ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের কঠোর সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউক; জ্যোৎস্নালোকে শয়ন করিয়া বংশীধ্বনি শ্রবণের পরিবর্ত্তে প্রখর দিবালোকে রণভেরীর গভীর নিনাদে অভ্যস্ত হউক, ইহাই আমরা প্রার্থনা করি; এবং সেই জন্য মধুসূদনের ন্যায় কবির আমরা অনুরাগী। পৌরুষ পুরুষোচিত ভাষার সহচর; সুতরাং মেঘনাদবধ বাঙ্গালীকে নিশ্চয়ই পৌরুষলাভে সাহায্য করিবে। মধুসূদন বঙ্গদেশে অনাদৃত হন নাই সত্য; কিন্তু তাঁহার ন্যায় কবির যে সম্মান প্রাপ্য তাঁহার স্বদেশীয়গণ এখনও তাঁহাকে তাহা প্রদান করিবার উপযুক্ত হন নাই। যদি বঙ্গদেশ কোনদিন পুরুষোচিত শৌর্য্য লাভ করিতে পারে, তবেই এদেশে মধুসূদনের ন্যায় কবির প্রকৃত সমাদর হইবে।

আকৃতি ও প্রকৃতি

এক্ষণে মধুসূদনের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। তিনি দেখিতে নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব ছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে তিনি অপেক্ষাকৃত স্থূলাঙ্গ হইয়াছিলেন কিন্তু প্রথম যৌবনে তাঁহার শরীর বিশেষ সুগঠিত ও সবল ছিল। কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মুখে এমন একটি কমনীয় ভাব ছিল যে, দেখিবামাত্র লোকের চিত্ত তাঁহার

* কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যথার্থ ই বলিয়াছেন—

মেঘনাদ-বীরনাদ করিলে শ্রবণ
বাঙ্গালা মহিলা-ভাষা না কবে কখন।

প্রতি আকৃষ্ট হইত। প্রশস্ত ললাট, আকর্ণবিশ্রান্ত উজ্জ্বল নেত্রদ্বয়, সতেজ সবল দেহ দেখিলেই তিনি যে একজন প্রতিভাবান্ পুরুষ, তাহা সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হইত। তাঁহার আকার ইঙ্গিত, প্রত্যেক কার্য্য পুরুষোচিত ভাব প্রকাশ করিত এবং যে ভাবপ্রবণতা কবি-প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ, তাহা তাঁহার প্রত্যেক কথায় ও প্রত্যেক কার্য্যে সূচিত হইত। বাল্য হইতে পূর্ণবয়স্ক পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ছিল; নিজের অমিতাচারের ফলেই শেষে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছিলেন; মিতাচারী হইলে সম্ভবতঃ তিনি দীর্ঘজীবী হইতে পারিতেন। মধুসূদনের সাধারণ ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেকরূপ ভ্রম আছে। আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তিনি জাতীয়ভাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে স্বদেশের প্রতি অনুরাগশূন্য বলিয়া সন্দেহ করেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। আচার, ব্যবহারে বৈদেশিক রীতির অনুকরণ করিলেও তাঁহার হৃদয় স্বদেশ-প্রেমে পূর্ণ ছিল; তাঁহার লিখিত পত্রের অনেক স্থলে তাঁহার স্বদেশানু-রাগ পরিস্ফুট রহিয়াছে। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত অনেকের ন্যায় তাঁহারও এই ভ্রান্ত সংস্কার ছিল যে, য়ুরোপীয়দিগের সমকক্ষ হইতে হইলে আচার ব্যবহার প্রত্যেক বিষয়ে, তাঁহাদিগেরই সদৃশ হওয়া আবশ্যক। তিনি বলিতেন—"আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন মুসলমান-রাজত্বকালে আহার্য্য, পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা প্রভৃতিতে মুসলমানী রীতির অনুকরণ করিয়াছিলেন, ইংরাজরাজত্বে আমাদিগেরও তেমনই ইংরাজী প্রথার অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।" একবার একটি সভাস্থলে কতকগুলি লোক তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার বৈদেশিকভাব-প্রিয়তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে মধুসূদন প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—"বন্ধুগণ! আমার বৈদেশিক পরিচ্ছদের জন্য আপনাদিগকে চিন্তিত হইতে হইবে না; আমার কোট, বুট যদি কোনদিন সাহেব হইয়াছি

বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয় তবে একবার একখানি দর্পণের দিকে চাহিলেই আমার সে ভ্রম দূর হইবে ; আমার বর্ণই আমার জাতি স্মরণ করাইয়া দিবে।”

ধর্ম্ম-বিশ্বাস

মধুসূদনের ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল আমরা পূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। খৃষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস কিরূপ কেহ একথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—“খৃষ্টধর্ম্ম জগতে সভ্যতা প্রচারের একটি বিশেষ উপায় ; কেহ ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে আমি তাহার সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রস্তুত আছি ; কিন্তু আমার মানসিক প্রবণতা হিন্দু ধর্ম্মেরই দিকে।”* বাস্তবিকও হিন্দুভাব তাঁহার মনে এরূপ প্রবল ছিল যে, বিজয়া-দশমী প্রভৃতি উৎসব দিনে তিনি কখনও কখনও ভাবে গদগদ হইয়া পড়িতেন। মধুসূদনের খিদিরপুরস্থ পৈতৃক ভবন তিনি তাঁহার কোন বাল্যবন্ধুকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বাল্যবন্ধু † তাঁহার মাতাকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। একবার জগদ্ধাত্রী-পূজার নিমন্ত্রণে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেবীমূর্ত্তি দর্শনে মধুসূদন এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অনর্গল অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আপনার শৈশবের ঘটনাবলীর সঙ্গে স্বর্গীয়া জননীর কথা স্মরণ হওয়াতে তিনি মাতার উদ্দেশে বলিলেন —“মা! তোমার যোগ্য পুত্র তোমার গৃহ কেমন সাজাইয়াছে ; আমি তোমার অযোগ্য সন্তান, আমার দ্বারা তোমার কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হয় নাই ; আমি কেবল তোমায় ক্লেশ দিয়াছি মাত্র।” বাহিরে কোট-হ্যাটের কঠোর আবরণের মধ্যে বাঙ্গালী হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা মধুসূদনের

* তাঁহার কথাগুলি এই ;—

**Christianity is a civilising agency. I would fight like a crusader if any one would speak against it, but my real feeling is Hindu.**

† বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনেক কার্য্যে এইরূপ প্রকাশিত হইত। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পর যে দুই একবার তিনি সাগরদাঁড়ীতে গিয়াছিলেন, প্রত্যেক বারেই আত্মীয় ও প্রতিবাসিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অতি মধুর ভাবে সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। দেশের কোন আত্মীয় কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি পরম যত্নে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেন। মধুসূদনের চরিত্রে নৈতিক দুর্ব্বলতা যথেষ্ট ছিল; কিন্তু স্বার্থপরতা, ক্রূরতা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নীচভাব একবারেই ছিল না। উদার, সরলস্বভাব পুরুষ কুপথগামী হইলে তাঁহার চরিত্রে যে সকল দোষ থাকিবার সম্ভাবনা,মধুসূদনের প্রকৃতিতে সেই সকল দোষই ছিল। মিতাচারে ও ইন্দ্রিয়-সংযমে অভ্যস্ত হইলে তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় গার্হস্থ্য জীবনে অতি মধুময় ফল প্রসব করিত।

মধুসূদনের জীবনের উপদেশ

মধুসূদনের জীবনের ইতিহাস অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রদ। প্রতিভা যতই সমুজ্জ্বল হউক, আত্মসংযম না থাকিলে তাহার পরিণাম যে কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে, ইহা হইতে আমরা তাহা শিক্ষা করিতে পারি। মনুষ্য যতই বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হউন,ধর্ম্মভাব ব্যতীত যে জগতে শান্তির প্রত্যাশা নাই, তাঁহার জীবন তাহারও দৃষ্টান্ত-স্থল। যাঁহারা প্রতিভার অভিমানে ধর্ম্মের ও নীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন এবং নিজের সুখের ও স্বার্থের জন্য পিতামাতা, সমাজ সকলের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, তাঁহারা যেন মধুসূদনের পরিণাম হইতে শিক্ষালাভ করেন। তরুণবয়সে নীতিশিক্ষার ও সদ্দৃষ্টান্তের অভাবে আমাদিগের দেশের কত প্রতিভাবান্ যুবক কিরূপ চরিত্রহীন ও আচার-ভ্রষ্ট হইতেছেন,তাঁহার জীবন হইতে আমরা তাহাও অনুমান করিতে পারি। মধুসূদনের ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত তাঁহার উন্মার্গগামী স্বদেশীয়গণের উপকার করিবে। বঙ্গভাষা কাহাকে লইয়া গৌরবান্বিত, আধুনিক বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে প্রতিভাগুণে স্বদেশের ও

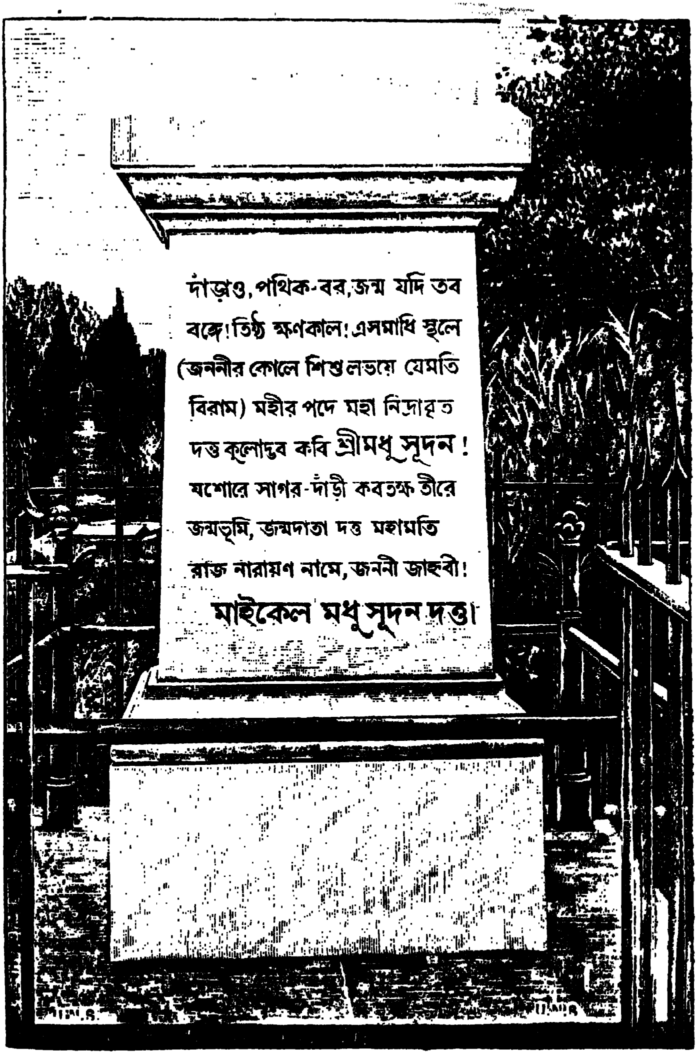
স্বসমাজের মুখ কে উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং গুণবান্, জ্ঞানবান্ ও হৃদয়-বান্ হইলেও বঙ্গীয় কোন্ কবির পরিণাম সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়, এই তিন প্রশ্নেরই উত্তরে ভবিষ্যৎবংশীয়গণ বলিবেন—"হতভাগ্য মধুসূদন।"

মধুসূদনের সম্বন্ধে তাঁহার স্বদেশীয়গণের কার্য্য

মধুসূদনের মৃত্যুর পর তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহার জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা করিয়া এইবার আমরা আমাদিগের গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিব। বঙ্গ-সাহিত্যের জন্য মধুসূদন যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এ কথা বলিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম। কিন্তু হায়! সে কথা বলিবার সুযোগ কোথায়? মধুসূদনের ন্যায় কবির উপযুক্ত জাতীয় স্মৃতিচিহ্ন এ পর্য্যন্ত সংস্থাপিত হয় নাই। অর্থাভাবে মধুসূদনের মৃতদেহ নিতান্ত হীনভাবে সমাহিত হইয়াছিল এবং বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সমাধির উপর কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত না হওয়ায় তাহা ক্রমে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল; কিন্তু বিধাতা বঙ্গদেশকে সে কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল, তাঁহার সমাধির উপর এক মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা

বঙ্গের ধনাঢ্য, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র অনেকেই তজ্জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয় সাধারণের সমক্ষে সেই সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বঙ্গের সুশিক্ষিত নর-নারীগণের প্রতিনিধিস্থানীয় অনেকে মধুসূদনের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া জাতীয় কর্ত্তব্য কিয়ৎপরিমাণে সম্পাদন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মধুসূদন স্বয়ং তাঁহার যে সমাধিলিপি রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ হইয়াছে। মনোমোহন বাবু তাঁহার বক্তৃতায় যথার্থই বলিয়াছিলেন—




মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ

"The poet has himself left behind him memorials far more precious and far more lasting than anything that either the wealth or the skill of his admiring countrymen could secure for him. His works will be read with admiration by generations yet unborn, and his name will live so long as the Bengali language and the Bengali race will live."

ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই উপলক্ষে যাহা বলিয়াছিলেন, বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অনুমোদন করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন যে, "যেখানে কবিদিগের বৈকুণ্ঠে কবিকুলরাজ হোমর, দান্তে, মিল্টন এবং আমাদিগের কালিদাস, ভবভূতি স্বর্ণসিংহাসনে বিরাজিত রহিয়াছেন, আমাদিগের গৌরবান্বিত প্রিয় কবিও সেখানে সম্মানে ও চিরশান্তিতে বিরাজিত থাকুন।" তাঁহার সমাধির উপর যে প্রস্তরময় স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কালে হয়ত তাহা চূর্ণ হইবে, কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থাবলীরূপ যে অক্ষয় স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিবে। যতদিন বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালিজাতির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন বঙ্গ-সাহিত্য হইতে "**শ্রীমধুসূদন**" নাম বিলুপ্ত হইবে না।*

* গ্রন্থকারের শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ, হেয়ার ও হিন্দুস্কুলের খ্যাতনামা শিক্ষক স্বর্গীয় হরলাল রায় মহাশয় মধুসূদনের সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছিলেন ;—

"নামে মধু, হৃদে মধু, বাক্যে মধু যার,
এ হেন মধুরে ভুলে সাধ্য আছে কার ?"

মিরর-সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের অধিনেতৃত্বে মধুসূদনের মৃত্যুর দিবস অনেক সাহিত্যসেবী এক্ষণে তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে মিলিত হইয়া থাকেন। মধুসূদনের জন্মদিবসে তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীতেও একটি উৎসব সম্প্রতি আরব্ধ হইয়াছে। মধুসূদনের কোন স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হউক, সাগরদাঁড়ী-বাসিগণ ইহা একান্ত প্রার্থনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণ কি তাঁহাদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না ?

সম্পূর্ণ